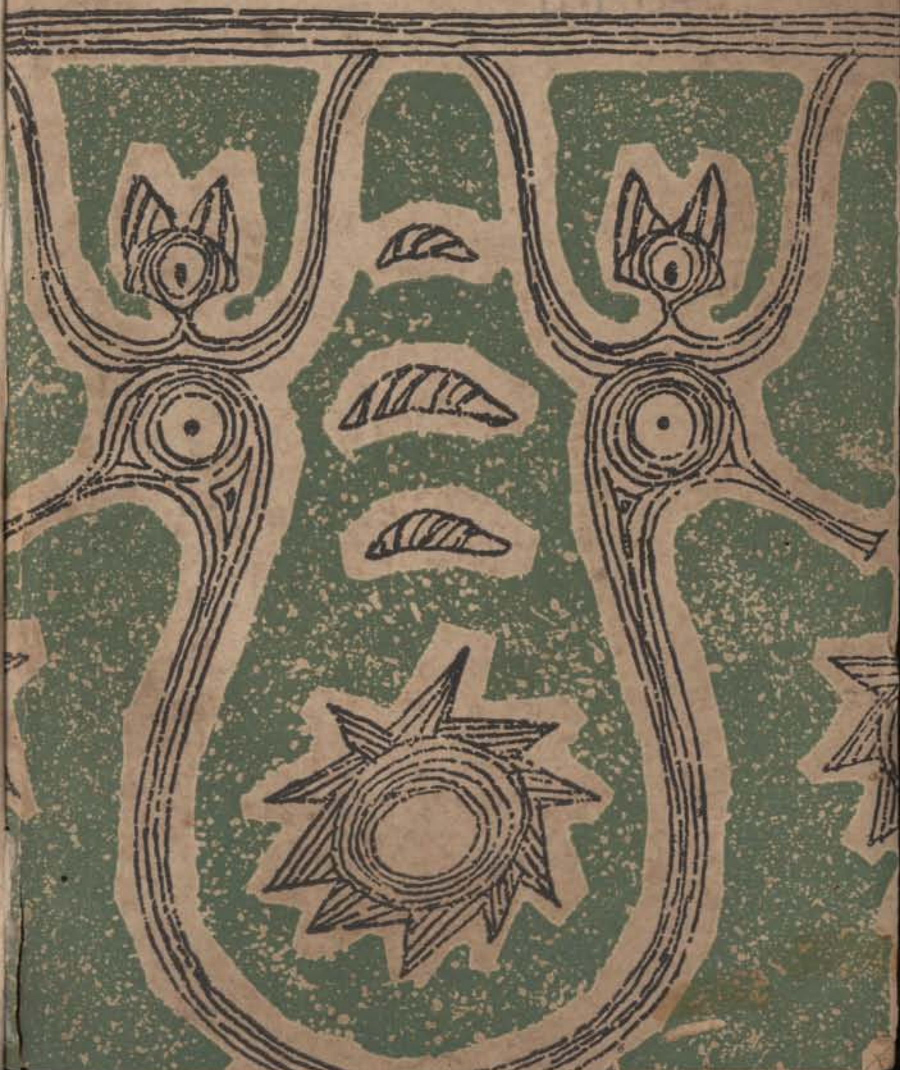
মাঘ ১৩৬৭

পরিচয়





পরিচয়

সূচীপত্র

১৩৬৭ ; ১৮৮২

মাঘ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

পরিচয়

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- রচনা ও এতৎবিষয়ক চিঠিপত্র সর্বক্ষেত্রে সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য
- উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে চিঠির উত্তর, লেখা সম্পর্কে মতামত ও অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- সম্পাদকীয় দপ্তর তিন মাসের বেশি অমনোনীত পাণ্ডুলিপির জন্য দায়ী থাকবেন না।

পরিচয়
৩০ বর্ষ; ৭ম সংখ্যা
মাঘ, ১৮৮২; ১৩৬৭

রবীন্দ্রচিত্রে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালের রবীন্দ্র-চিত্রকলার সমালোচনায়, প্রায়ই চোখে পড়ে পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের নামের কোলাহলপূর্ণ সমাবেশ। কোনো সমালোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথের ছবি ক্যান্‌ডিন্‌স্কীর প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রসূত; কাউকে স্মরণ করিয়ে দেয় পিকাসো বা মাতিসের কথা; কেউ আবার আবিষ্কার করেন মদিলীয়ানীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতগুলি ভিন্নধর্মী শিল্পীর নামের যুক্তকরণ, অনেকসময় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিবরণের অভাবে বিসদৃশ ও হাস্যকর মনে হলেও, এর পিছনে কিন্তু একটা সত্য নিহিত রয়েছে। আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের চিত্রে খুব বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। এই উপস্থিতি, একদিকে সাম্প্রতিক শিল্পজগতে যেমন রবীন্দ্রনাথকে সম্ভ্রান্ত আসনে উন্নমিত করেছে, অন্যদিকে সমালোচনা-জগতে তাঁকে বিদেশী শিল্পীদের প্রভাবের শিকারে পরিণত করেছে। এই প্রভাব আবিষ্কারের উন্মত্ত প্রয়াসে, সমালোচকদের অনেক সময় আজগুবী দূরকল্পনার শরণ নিতে হয়। ক্লের ছবিতে ব্যবহৃত রেখার অনুরূপ ঢঙ যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো চিত্রে পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই ১৯২২ সালে কলকাতায় ক্লে-ক্যান্‌ডিন্‌স্কীর ছবির প্রদর্শনী রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, কিংবা ১৯২৬ সালে ইওরোপ ভ্রমনকালে হয়তো এদের শিল্পকর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল—এই ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে রবীন্দ্রচিত্র আলোচনা বাতুলতার নামান্তর। প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে, এইরূপ সমালোচনার রেওয়াজ ত্যাগ করার দিন এসেছে। কষ্টকল্পিত প্রভাব-আবিষ্কারের পরিবর্তে, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ অনেক বেশী মূল্যবান; কারণ রবীন্দ্র-

পত্রিকা প্রসঙ্গ

একতা ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ মুখপত্র : ১৯৬০। সম্পাদক : পবিত্র সরকার ॥

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ পত্রিকা (বিজ্ঞান বিভাগ) : ১৯৬০। সম্পাদক : পীযূষকান্তি রায় ॥

যে গণতান্ত্রিক চেতনায় ছাত্রসংসদগুলির উদ্ভব তারই অগ্রগতিতে সম্ভবত বিদ্যায়তনে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা। বছরে একটি সংকলন প্রকাশ ছাত্র-সাধারণের সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের উল্লেখযোগ্য সহায়ক না হলেও, ছাত্র মনের ও মননের, সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার সামগ্রিক ধারক ও মুখপত্র হিসাবে তার মূল্য অনস্বীকার্য। প্রচলিত অর্থে সাময়িকপত্রের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েও, তাই শিক্ষানিকেতনের পত্রিকাগুলি, উদ্দেশ্যে ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার অধিকারী। এই স্বাতন্ত্র্যের পটভূমিকাতেই ছাত্র-সংসদের মুখপত্রগুলি বিচার্য।

একতার বাংলা বিভাগটির শুরু জর্মান প্রতীকী কবি রিল্‌কের উদ্ধৃতিতে, অরুণ সেন ও পদ্মনাভ দাশগুপ্তের স্থাপত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে। শহরজীবনের বৈপরীত্য ও কলকাতার স্থাপত্যে দুই শতাব্দীর মানসিকতা এ প্রবন্ধে সার্থকরূপ লাভ করেছে। শেষাংশটি আরো বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। "আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা" সংক্রান্ত অশোক ভট্টাচার্যের আলোচনাটি একটি সৃষ্টিশীল রচনা। আত্মসচেতনতা ও যুগচেতনায় সমৃদ্ধ আধুনিক শিল্পীরা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর গৌরবে. এদেশেও যে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে এ বিশ্বাসে লেখক সোচ্চার। তাছাড়া বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বিজন পুর-কায়স্থের প্রবন্ধ "নীতি ও মূল্যবোধের কয়েকটি দিক।" লেখক মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নীতি ও মূল্যবোধের বিচার করেছেন, বস্তুজগতের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস ও সমাজপ্রগতির প্রতি অবিচল আস্থার পটভূমিকায়। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অধিক অবকাশ থাকলেও মঞ্জুলা সরকারের প্রবন্ধটি সার্থক।

কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের আলোচনা করে তিনি কালিদাসের ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা নৈপুণ্য ও কনট্রাস্ট সৃষ্টির কুশলতা প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। অন্যদিকে ইংরেজী বিভাগের শুরুও প্রবন্ধে। মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা স্বল্পপরিসরে চার্টিস্‌ম্ পর্যন্ত ইংরেজ শ্রেণীসংগ্রামের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

গল্পের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'ঝড়ো হাওয়া'। ভাঙা সিনেট, মজবুত আশুতোষ বিল্ডিং—গোটা ইউনিভার্সিটির পটভূমিকায় লেখক বর্তমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় বিড়ম্বিত ছাত্রজীবনের আর্তিকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। চন্দ্রকুমার প্রসাদের "কাঁচপোকার টিপ"-এ স্যানাটোরিয়ামের নিখুঁত চিত্র ও টি. বি. রোগীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা জীবন্ত। অসীম সেনগুপ্তের "কারো একটা গল্প" ছোটগল্পে সাম্প্রতিক নিরীক্ষার লক্ষণাক্রান্ত।

প্রায় সবকটি কবিতাই সুলিখিত। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মনিভূষণ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত বসু, রঞ্জিত সিংহ ও আশিষ সান্যালের কবিতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদে কেতকী কুশারী সার্থকতা দেখিয়েছেন।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য সাময়িক ঘটনার মন্তব্য সহ প্রতিলিপি, বাংলায়—"প্রাসঙ্গিক" এবং ইংরেজীতে "topics and opinions"। প্রাসঙ্গিকে স্থান পেয়েছে সম্পাদকের কথা, সাতটি মৃত্যু (রাজশেখর বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, ইন্দিরা দেবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পাস্তেরনাক, আলবেয়র কামু ও সিনেট), কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের জনসংবর্ধনা ও শিক্ষাসংস্কারের মূল সমস্যার কথা। ইংরেজী অংশে বিচিত্র বিষয়ের প্রস্তাবনায়, সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে, ছাত্রজীবনের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন সবিশেষ উপস্থাপিত হলে ভালো হত।

হিন্দী ও উর্দু বিভাগের আলোচনায় আমার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এই বিভাগ দুটি দেশের বর্তমান ভাষাদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার ছাত্রসমাজের সাধারণ ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে "একতা"র রবীন্দ্রবিষয়ক বিশেষ আলোচনা থাকা উচিত ছিল। "একতা"য় রবীন্দ্রস্মরণী বিশেষ সংখ্যা সম্ভবত ভবিষ্যতে সে অভাব পূর্ণ করবে।

চিত্রকলাকেই ভারতীয় আধুনিক শিল্পের প্রারম্ভিক প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। এবং আধুনিকতার এই ইঙ্গিতগুলির সমাগমের কৈফিয়ত পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিগত জীবনে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে ; ইওরোপে পাড়ি দেবার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য, রবীন্দ্র-চিত্ররীতির সমান্তরাল আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পজগতের বহু ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এবং সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলায় প্রকাশিত নূতন ধারার নেপথ্যে যে মেজাজটা উপস্থিত, সেটা মূলত বিদ্রোহী। স্বভাবতই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী পরস্পরের খুব নিকটবর্তী। সুতরাং যেটাকে প্রায়শই বিদেশী প্রভাব বলে মনে করা হয়, সেটা প্রকৃতপক্ষে প্রসঙ্গের সাযুজ্য এবং প্রকরণের সামীপ্য। রবীন্দ্র-চিত্রকলায় আধুনিক ধারায় উপস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত বিচার এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার ইতিহাস সর্বসাকুল্যে পনের বৎসরের অধিক নয়। ১৯৩০ সালের কিছু আগে থেকে কবি আন্তরিকতা সহ ছবি আঁকায় মন দেন। কিন্তু এত স্বল্পকালস্থায়ী হয়েও তাঁর চিত্রাঙ্কন বিশেষস্তরে স্থিতিশীল না থেকে, অসম্ভব গতিতে এক রূপ অতিক্রম করে অপর রূপ পরিগ্রহণে এগিয়েছে। প্রথম যুগে যা গড়ে উঠেছিল কবিতা রচনার সংশোধনকে আশ্রয় করে, পরবর্তী যুগে রেখার মায়াজাল রবীন্দ্রনাথকে অবিমিশ্র চিত্রাঙ্কনের জগতে নিয়ে গিয়েছিল ; রঙের বিচিত্র আলোকে সে জগৎকে শিল্পী উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। রঙ ও রেখার ব্যবহারে যেমন কার্পণ্য ছিল না, বিষয় নির্বাচনেও কল্পনার দারিদ্র্য দেখা যায় নি। শিল্পীর মননের এই নির্ভীক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রচিত্রে নিভৃত ভাবের জটাজুট এবং তার প্রকাশভঙ্গীর জটিল শাখা-প্রশাখা—যে দুটি বৈশিষ্ট্য আধুনিক শিল্পের অন্যতম পরিচায়ক।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার এই একান্ত স্বতন্ত্র চরিত্র তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার ধারার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, আত্মবিস্মৃত ভারতীয় শিল্পীদের, স্বদেশের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছিল। অজন্তা ও মুঘল-রাজপুত চিত্র-সামগ্রী আবিষ্কারের নূতন শিহরণে এবং জাত্যাভিমানের প্রাথমিক উত্তেজনায় 'ইণ্ডিয়ান স্কুলের' জন্ম। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তভাগে, অবনীন্দ্রনাথকে সম্মানজ্ঞাপন প্রসঙ্গে,

এ আন্দোলনের বলিষ্ঠ অবদানকে সামনে তুলে ধরেছিলেন : "তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্মউপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।" (১৯৪১) পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির নিঃসাড় অনুকরণের পথ থেকে, ভারতীয় শিল্পচর্চাকে স্বগৃহাভিমুখী করার প্রচেষ্টা, নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ঐতিহ্যের প্রতি এই সংসক্তি, নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের সূতিকাগৃহ থেকে চিতাশয্যায় পরিণত হতে বেশী সময় লাগে নি। কারণ অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্ররীতি, কিছুকাল পরে তাঁর শিষ্যদের হাতে, প্রাচীনের গীতধর্মী নকলেই পর্যবেশিত হল। যদিও অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল স্বীয় উদ্ভাবনীশক্তিবলে, এরই মধ্যে পরে এনেছিলেন লোকশিল্পের প্রেরণায় অঙ্কিত নূতন চিত্রের সতেজ সবলতা। কিন্তু অধিকাংশ শিষ্য ললিতলবঙ্গলতা ও পেলব-পুরুষ প্রেমিকের ছবিতেই আজীবন মগ্ন হয়ে রইলেন। মুকুল দেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে, সমসাময়িক শিল্পীদের এই আচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তীব্র ইঙ্গিতটি প্রণিধানযোগ্য :

"...বিশ্বসৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখ এর সর্বত্রই খুব একটা জোর আছে, এ ভারি শক্ত—এর সৌন্দর্য বাবুয়ানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ আমাদের বাংলাদেশের কার্ত্তিকের মত গোঁফে তা দিয়ে ময়ূর চ'ড়ে বেড়ায় না। বিশ্বের এই বিশাল সৌন্দর্য অসুন্দরকেও অনায়াসে আপনার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে এবং তাতে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। তোর তুলি মায়া সরস্বতীর পায়ের তলায় আলতা দেবার তুলি হ'লে চ'লবে না।" (২৫শে এপ্রিল, ১৯১৩)

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy of Art ভাষণে এ বিষয়ে আরও স্পষ্টবাদী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ : "কোনরকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল যাতে জুড়ে দেওয়া যায় এমন জিনিস মেপেজুকে, দেখে-শুনে তৈরি করলেই হল—এই যে যুক্তি আমাদের শিল্পীরা যেন তা মেনে না নেন।"

অসুন্দরকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, বাঁধা-ধরা রীতির বন্ধনে চিত্রাঙ্কনকে বন্দী করার প্রথাটাকে, রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল সৃষ্টির নিয়ম-বিরোধী। কারণ ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত ও বাধাহীন গতি তার আপন প্রকাশভঙ্গী তৈরি করে নেবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই মুঘল-রাজপুত স্বল্পায়ত চারুচিত্রের গীতধর্মী ধুমে আচ্ছন্নতা, রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতীয় চিত্রকলার একজাতীয় পরাধীনতা—অনুকরণের দায়িত্বের কাছে রঙ ও

রেখার বশ্যতা স্বীকার এবং সময়ের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারার অক্ষমতা। "…no such exclusive definition can be made that a particular kind of Art is Indian or Oriental or of any other specific kind. One knows how the history of Art in Europe has been changing fast…the time has come when our artists should come into closer touch with modern life in India. They must realise the artistic meaning of life and give expression to it, for there can be no great Art which does not move with Life itself." (-Some Stray Thoughts on Modern Art in India : Four Arts Annual, 1935). 'মডেল' রূপায়ণের কর্তব্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির মধ্যেই ভারতীয় চিত্রকলা তার সার্থকতা খুঁজে পাবে। এই দায়ভারমুক্ত রঙ ও রেখার সাবলীল সমাবেশ, রবীন্দ্রনাথের মতে, শিল্পের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রধান সড়ক। কারণ কমনীয় বিষয়বস্তুর শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এই উপকরণগুলির তৈরি শক্ত পথেই, এক উদ্দাম, দুঃসাহসিক অভিযান চলতে পারে, এতদিনের উপেক্ষিত, অসুন্দরের অনাবিষ্কৃত রাজ্যের দিকে। বিশ্বসৃষ্টির আলো-আঁধার, সুন্দর-অসুন্দরের এই সম্পূর্ণতার অনুসন্ধানে শিল্পের সত্য রূপটি ফুটে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা আরও স্পষ্ট হয় যদি মুকুল দেকে লেখা উল্লিখিত চিঠিটি থেকে বাকি অংশটুকু উদ্ধৃত করা যায়।

"…যথার্থ সৌন্দর্য জিনিসটি মোহ নয়, মায়া নয়, তা দশজনের চোখ ভোলাবার ফাঁদ নয়—সৌন্দর্য হচ্ছে সত্য। যতক্ষণ সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে সত্যের সেই স্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রশস্ততা কঠোরতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করা যেতে পারবে না।" তারপরে বলছেন—"তোর তুলিতে পৌরুষ দেখতে চাই—তার বাঁট বজ্রের মত শক্ত হবে এবং সর্বত্রই সে অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তোর চারদিকে যা তুচ্ছ জিনিস আছে, যা অসুন্দর, তার মধ্যেও সুন্দরকে তুই দেখবার সাধনা কর। তাহলেই বিশ্বসরস্বতী তোর সহায় হবেন।…"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন চিত্রকলায় হাত দিয়েছিলেন, তখন নিজপ্রদত্ত এই উপদেশের কথা নতুন করে তাঁর চিন্তাজগতে পুনরাবির্ভূত হয়েছিল।

তাই তাঁর প্রথম যুগের ছবিগুলির স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কলমের মুখ। অর্থাৎ শিল্পীকে ভেবেচিন্তে আঁকতে হয় নি, রেখার স্রোতই তাঁকে 'ডিজাইন' সৃষ্টিতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সংশোধনের একটা জটলাকে কোন দিকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলে ঠিক ডিজাইনটি হবে, এটা শিল্পীর অন্তর্নিহিত ছন্দবোধই নিঃশব্দে নির্ধারিত করে দিচ্ছিল।

এই অবিমিশ্র বিমূর্ত ছবিগুলি, সাদৃশ্যরচনার দায়িত্বমুক্ত রেখার স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। সংগীতে যেমন, কথামুক্ত সুর ও শব্দের সন্নিবেশের মধ্যে শব্দগুলির অবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে, শিল্পেও তেমনি বিমূর্ত রেখার এই জাতীয় ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসে, চিত্রকলার মূল উপাদানের কৌমার্যকে ফিরে পাওয়া যায়। এর কয়েক বৎসর পূর্বে, ইওরোপে ক্যানডিন্স্কী "objects harm my Painting"—এই কথা ঘোষণা করে, রেখার বিমূর্ত সন্নিবেশে শিল্পের প্রকৃত সত্তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টির বিশুদ্ধতা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। বাস্তব জগতের পরিচিত বিষয়—ফুল, লতাপাতা, জন্তু-জানোয়ার—ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অচেতনভাবেই রেখাগুলি ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কারণ এ রেখার রচয়িতা মানুষ—জগতের সঙ্গে পরিচিতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাই যার চরিত্র। তাই আধুনিক abstract চিত্রকলার গুরু ক্যান্‌ডিন্‌স্কীর ছবিতেও বিমূর্ত রেখাগুলি কখনও ফুলের অর্ধ-পরিচিত আভাসে, কখনও বা প্রজাপতির রঙীন পাখার সাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে। অবশ্য Mondrian ও তাঁর শিষ্যরা, বিষয়বস্তুর বাস্তব আকৃতিকে কুরে কুরে খেয়ে, তার দেহ থেকে সাদৃশ্যের শেষ রেশটুকু অপসারিত করে, বিমূর্তিকরণের শেষ ধাপ কেবলমাত্র সরল রেখা ও কোণের সমাবেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্রমিক স্তর-পারম্পর্যে ছবিকে বস্তুজগতের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত করতে গিয়ে, মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক রেখাতে দাঁড় করানোর এই পদ্ধতিরই বিপরীতমুখী কায়দা হল, একেবারে শুরু থেকেই ক্যানডিন্স্কীর মতো, ঐ প্রাথমিক বিমূর্ত উপকরণ—রেখা ও রঙ দিয়ে ছন্দ আবিষ্কারের যাত্রা আরম্ভ করা। এই শেষের পথটিতেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমন তার স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছিল।

এবং এ যাত্রার অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী চিত্রে এল মানুষের প্রতিকৃতি, আজগুবী জানোয়ারের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি। অবশ্য যেহেতু সাদৃশ্যরচনার পরিবর্তে, রঙ ও রেখার ছান্দস

সমাবেশই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইজন্য, ছবিগুলিতে একটা আশ্চর্য বেগ ও গতি এসেছে। পরিচিত বিষয়বস্তু থাকলেও, বস্তুনিরপেক্ষ রেখা ও রঙের ছন্দেরই এখানে আধিপত্য। আগে ছন্দ, পরে তার বাহনরূপে এসেছে বাস্তব জগৎ। তাই সাদৃশ্যবিচারের পূর্বেই, ভাববার অবকাশ না দিয়েই, ছবিগুলির ছন্দ ঝড়ের বেগে দর্শকের মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

আসলে ছন্দের এই উদ্দাম গতি সঙ্গতি রেখেছে শিল্পীর ভাবের উন্মাদনার সঙ্গে। বিমূর্ত নক্সাগুলি রচনার কালেই, তাদের ভাব-প্রকাশের এই চরিত্রটা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন—"Some lines showed anger, some placid benevolence, through some lines ran an essential laughter……" (চিত্রলিপির ভূমিকা থেকে)

নিজের ছবি সম্বন্ধে আর একটি মন্তব্য : "It is for them to express and not to explain." (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় সাদৃশ্য রচনা বা কাহিনী বর্ণনার কর্তব্য থেকে মুক্ত হলেও, ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব থেকে শিল্প কখনও স্খলিত হয় নি। এই 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'ই রবীন্দ্রকলার 'চলতি হাওয়া' বা আধুনিকতার মূলমন্ত্র।

প্রায় তিন হাজার প্রকৃতি বিষয়ক, মনুষ্য প্রতিকৃতি ও জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে রেখা ও রঙ, বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, তাকে অতিক্রম করে বিশেষ কয়েকটি ভাবকে প্রকাশ করেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছবির জগৎকে পরিচিত পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হয়। অনেক সমালোচক এই কারণে তাঁর চিত্রে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান পান। আসলে বোধ হয়, প্রকৃতির যে আদিম স্বাভাবিক ছন্দকে ভেঙে-চুরে আমরা আধুনিক জগতের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে ছন্দের সেই ঝোড়ো, মাতাল বেপরোয়া রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকেই চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ছবির বিষয়কে রঙ ও রেখার এই আদিম দেবীর পদানত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা স্মর্তব্য :

"রবিকার ছবিতে যা আছে, তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে সব রং নিয়ে উনি কারবার করেছেন নেচারে সে সব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এসব থেকেই হয়েছে।…অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রং রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকোন সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের

আনন্দ দিয়ে নির্মিত ; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে।" (আর্টপ্রসঙ্গ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

সত্যই, যেন একটা গভীর উষ্মা রবীন্দ্রনাথকে অস্থির করে তুলছিল। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদের বাসনাতেই বোধ হয় অসুন্দরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। এ প্রতিবাদ কি সমসাময়িক চিত্রকলার অধোগতির বিরুদ্ধে, না রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়াস, না নিজেরই সাহিত্যিক-জীবনে অসুন্দরকে এতদিন ধরে একঘরে করে রাখার প্রায়শ্চিত্ত? মোট কথা, রবীন্দ্রচিত্রে পুরনোকে অস্বীকার করে দর্শককে আঘাত দেবার এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাঙনধর্মী সুর রয়েছে। "আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে 'বেশ সুন্দর হয়েছে' তখনি আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রানী চন্দ)।

গদ্য ছন্দের নিরূপক হয়ে, কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাচারে সাহসী হন নি। কারণ কবিতাতে তিনি পরিচিত কবি, আর ছবিতে নির্ভীক বিজ্ঞানী ; এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ বহু-বিস্তৃত।

তবুও সমকালীন কবিতার বহু চরিত্রকে ছবির জগতেও দেখতে পাই। 'কিনু গোয়ালার গলি'র হরিপদ কেরানী, 'ছেলেটা', 'সাধারণ মেয়ে'—এদেরই আত্মীয়-স্বজন, রেখার জালে ধরা পড়েছে 'খাপছাড়া' ও 'সে'-তে। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলি ভাবাবেগের এক বিচিত্র প্রদর্শনী। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থালির মানুষ এরা—আপিসের কেরানী, স্কুল-পালানো ছাত্র, রোগজীর্ণ শিক্ষক প্রভৃতি।

কিন্তু ছবিতে শুধুমাত্র হাল-আমলের শহুরে জীবনযাত্রার আভাস ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই, রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সম্পূর্ণ রূপটা ধরা পড়ে না। ইতিপূর্বে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতেও এর সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে। আসলে, রবীন্দ্র-চিত্রকলায়, বাস্তবানুকরণকে ছাড়িয়ে ভাবপ্রকাশের গুরুত্ব স্বীকার এবং এই প্রকাশভঙ্গীর বিচিত্র রূপ-রেখাই, তাঁর আধুনিক শিল্পী-মনের প্রধান পরিচায়ক।

এই expressionist প্রবণতার সর্বাধিক বলিষ্ঠ প্রকাশ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে। কোনো পরিচিত পশুর চিত্র আঁকতে গিয়ে

বাস্তবের প্রতি আনুগত্যে শিল্পী বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারেন নি। রেখার ছন্দ, চেনা আকৃতিটাকে বিকৃত করে টেনে নিয়ে গেছে অপরিচিতের দিকে, সৃষ্টি হয়েছে কিম্ভূতের। ফলে কোনো ছবিতে দেখি বাঘের রূপ নিতে গিয়ে চরিত্রটা এক বিচিত্র সরীসৃপে পরিণত হয়েছে; কোথাও বা অদ্ভুত পাখি তৈরি হয়েছে। আসলে তাঁর ছবিগুলি বাস্তব জগতের দাবিকে কতখানি মানল বা না মানল—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। "আমাদের আনন্দ হোচ্ছে সুস্পষ্ট দেখার। কী দেখলুম তা নয়। ...একটা উটপাখী বা লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ—আমি হয়তো দেখিই নি কোনদিন, কিন্তু একটা কিছু অদ্ভুত জন্তু এঁকেছি—মানতেই হবে যে একটা কিছু অদ্ভুত এতে আছে" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)। তাই এই সব প্রাণীর বিচিত্র দৈহিক ভঙ্গীকে অবলম্বন করে, হিংসা, লোভ বা ঐ জাতীয় কোনো বীভৎস ভাবকেই রবীন্দ্রনাথ আঁকতেন। পশুজগতের সঙ্গে জড়িত যে বীভৎসতার অনুষঙ্গ মানুষের মনে বিরাজ করে, তাকেই রূপ দেওয়াটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এ জগতের বাসিন্দাদের দেহের সঠিক মাপ-জোক এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। রেকাবভতি টোমাটো আঁকতে গিয়ে পিকাসো যেমন বলেছিলেম—"I must paint the 'eat' that the tomato implied।" -মনে রাখা দরকার যে ভাব-প্রকাশের তাগিদে, শিল্পে বাস্তবকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করার রীতিকে স্বীকৃতি দিতে, পাশ্চাত্ত্য শিল্পীরা সাহস করেছিলেন গত শতকের শেষ থেকে। অথচ ভারতবর্ষে এর ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একে আয়ত্তে আনতে বেগ পেতে হয় নি। এ চিন্তাটা সহজভাবেই তাঁর চিত্রাঙ্কনে প্রবেশ করেছিল। কারণ এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পিছনে সমর্থন ছিল সহস্র বৎসরের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের। কোনারকের মন্দিরগাত্রে গজসিংহের প্রতিকৃতি বা পুরাণে জটায়ুর কল্পনা এই ঐতিহ্যেরই স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে 'ফ্যানটাষ্টিক্' পশু এদেরই বংশধর। দেব-দেবীর অদ্ভুত বা অসম্ভাব্য শক্তিসামগ্রী বোঝাবার চেষ্টায়, অনেকগুলি মাথা, হাত বা চোখ দেখানোর রেওয়াজ, ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি বিশিষ্ট অবদান। রবীন্দ্রনাথ এই দুঃসাহসিক চিন্তনেরই উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রচিত্রের ঋজু কঠিন শিরদাঁড়াটা ভারতীয় ভাস্কর্যের বলিষ্ঠতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্যসংবলিত চিত্রে রঙের এক বিচিত্র সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রথম যুগে, কলমের মুখে রচিত বিমূর্ত ডিজাইনগুলিতে রেখা

যেমন আপন স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই ছবিগুলিতে রঙকে রবীন্দ্রনাথ তেমনি আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার দিলেন। গাছপালার পরিচিত আকৃতিকে তো ছন্দের খাতিরে পরিবর্তিত করা হয়েছেই। তাছাড়াও, বিভিন্ন রঙের প্রলেপ পড়ে কাগজের জমিটাও গেছে পালটে। ঘন নীল ও লাল, গাঢ় সবুজ বা কালোর প্রতিবেশী হতে এখানে ভয় পায় না। 'ইণ্ডিয়ান স্কুল' পরিবেশিত ছবিতে, সাধারণত সম্বাদী, বাদী বা বিবাদী রঙ পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেওয়া হত। একটা পাতলা স্বচ্ছ রঙের পোঁচ, মোলায়েম ভাব আনতে সাহায্য করত। রবীন্দ্রনাথ রঙ ব্যবহার করলেন অন্য কায়দায়: "...আমি তো ছবিতে একই বারে রং দেই না। আগে পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রং তৈরী করি মানানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চালাই। তাতে করে হয় কী—রংটা বেশ একটু জোরালো হয়।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ) ফলে, একদিকে যখন অবনীন্দ্র-শিষ্যদের ছবিতে, স্বচ্ছ রঙের প্রলেপে একটা ধোঁয়াটে আধারের ভাব সৃষ্টি হল, রবীন্দ্রনাথের চিত্রে, ঘন রঙের চাপ একটা গাঢ় জমাট আবহাওয়া তৈরি করে, তেলরঙে আঁকা ছবির effect আনল। এই প্রায়-অন্ধকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি, দর্শকের মনে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর অনুষঙ্গ আনে। মনে হয়, কিম্ভূত জন্তুদের উপযুক্ত বাসস্থান এই অস্পষ্ট বিষণ্ণ গাছপালার জঙ্গল। তাছাড়া শিল্পীর স্বাধীন বিচরণের অবাধ সুযোগ আছে Primitiveএর কল্পনায়।

কথাটা আরও স্পষ্ট হয় যদি গগ্যাঁর শিল্পীজীবনের ইতিহাসটা মনে রাখি। ইওরোপীয় শিল্পকলায় আধুনিক যুগের শুরুতে, শিল্পের বিলাসপুরী পারী ত্যাগ করে গগ্যাঁ গম্ভীর রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন তাহিতির জঙ্গলের আদিবাসীদের মধ্যে। তখন থেকেই, আফ্রিকার নিগ্রো ভাস্কর্যের অনুকরণে ও আদিবাসীদের দ্বীপপুঞ্জের নবঘন সবুজ বনানীর অনুপ্রেরণায় চিত্রাঙ্কন, আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারারূপে পরিগণিত হল। কিন্তু এদের এই অনুরক্তির নেপথ্যে একদিকে যেমন ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলের অচেনা রহস্যঘেরা জঙ্গলের প্রতি রোম্যান্টিক আকর্ষণ, অপরপক্ষে ছিল তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্য সভ্যজগতের বাধা-বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত সম্পূর্ণতা, শিল্পের আঙ্গিককে নির্জীবতার সীমায় টেনে এনেছিল; চিত্রাঙ্কনের এই প্রাথমিক উপকরণগুলিকে তাজা অবস্থায় পেতে হলে ফিরে যেতে হবে পৃথিবীরই আদিযুগে—যখন রঙ ও রেখা সম্পর্কে

মানুষের একটা তীক্ষ্ণ অথচ অকৃত্রিম বোধশক্তি ছিল, যার ফলে তার আবেগ-অনুভূতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতে পারত সহজ অনাড়ম্বর রূপে। আধুনিক পৃথিবীতে এ আদিমতার একমাত্র প্রতিলিপি রয়েছে আফ্রিকার জঙ্গলে, 'বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।' তাই কল্পনার মহাযাত্রা শুরু হল সেই দেশে।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে, বিষয়বর্ণনার রেওয়াজ থেকে, রঙ ও রেখাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের প্রাথমিক সবলতা ফিরিয়ে দেবার জন্য। এই মুক্ত রঙ ও রেখার স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ সম্ভব আদিম জঙ্গলের রহস্যের মধ্যেই, বা গভীর রাত্রির নিশ্চয়তায়, অবাস্তব পশুদের সান্নিধ্যে—যেখানে প্রতি মুহূর্তে সভ্যতার সংযম-শক্তি বাধা দিতে আসবে না। যে চঞ্চল রেখা ও রঙগুলি আধুনিক জগতের নিয়মের রাজত্বে চলতে গিয়ে হোঁচট খায়, মানবদেহকে আশ্রয় করতে গিয়ে পাঁচজনের দাবির কাছে মাথা নত করে, রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন পশুজগতের অপরিচিতির মধ্যে, যেখানে প্রকৃতির সৃষ্টি অসম্পূর্ণ এবং সেই কারণেই যেখানে শিল্পীর কল্পনা নিত্য-নূতন রূপ আবিষ্কারের দুঃসাহসিকতায় পাড়ি দিতে পারে।

Primitive-এর প্রতি এই আকর্ষণের পিছনে, ফর্মকে নূতন পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যই শুধু নয়, অসুন্দরকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার একটা ব্যগ্র বাসনাও লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কবিতাতে ("নবজাতকের" 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'রাত্রি' ; "পত্রপুটের" অধিকাংশ পদ্যে) এই জাতীয় চিত্রকল্প বহুবার দেখতে পাই। তিল তিল করে পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য চয়ন করে যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণ কদাকার প্রাণী জড়ো করে, তাঁর অসুন্দরের জঙ্গল তৈরি করেছিলেন। বীভৎস রসের প্রকাশের জন্যই কি এদের সমাবেশ? সমকালীন যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুদ্ধের প্রস্তুতি, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার এবং আরও যে সব অমানবিক বীভৎসতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, তারই কি প্রকাশ রয়েছে, তাঁর কাব্য ও ছবিতে কৌৎসীত্যের চিত্রকল্পে? নাকি এ আকর্ষণের সূত্র রয়ে গেছে 'ছেলেবেলায়' বর্ণিত কবির শৈশবে, যখন শিশু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা জোড়াসাঁকোর বাড়ির রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপ্তিকে, ফ্যানটাস্টিক্ জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ভরিয়ে তুলত?

যাই হোক, চিত্রকলাকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দেবার জন্য, একেবারে সৃষ্টির আদিতে গিয়ে ধাক্কা দেবার এই রেওয়াজটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং ভারতবর্ষে আধুনাতন শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম যিনি শিল্পসৃষ্টির শুরুর সারল্য আবিষ্কার করেছিলেন আদিমতার স্বতঃস্ফূর্ততায়। কেবল ইতিহাসের আরম্ভকালীন আদিমতাতেই নয়, মানুষের জীবনের প্রারম্ভেও অর্থাৎ শৈশবেও শিল্পসৃষ্টির যে সরল স্বাভাবিক অনাড়ম্বর সুরটি নিহিত আছে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা প্রখর ছিল। তাই পৌত্রী পুপুর জন্য আঁকা ছবি ও লেখাতে স্বতঃস্ফূর্ততা এত প্রবল, রেখার বেগও এত গতিশীল। কারণ এর সমঝদার যে, সে শিশু। "ছড়ার ছবি"র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।" 'খাপছাড়া' বা 'সে'র ছবিতেও, শিশু-দর্শক অর্থের জন্য অভিযোগ করবে না, রূপ নিয়ে খেলা করবে।

অবশ্য কেবলমাত্র ঘন রঙের সন্নিবেশে গম্ভীর বিষণ্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহাওয়া সৃষ্টিই, রবীন্দ্রচিত্রের মূল উপজীব্য নয়। অসম্ভব রকম উজ্জ্বল রঙের দুঃসাহসিক সমাবেশও বহুবার চোখে পড়ে। এমনকি, ঘন গাঢ় রঙে আঁকা তমসার ছবিগুলিও একটা আশ্চর্য জোরালো আলো বিকীরণ করে। এর কারণটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রঙ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, যেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবনীন্দ্র-শিষ্যদের চিত্রে আলো অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত ; একটা অস্পষ্ট আঁধারের পটভূমিতে বিষয়বস্তু বর্ণনা হত। আগে দেখেছি, Primitive ভাবাপন্ন ছবিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই আঁধারের রহস্যকে কিভাবে আরও ঘনীভূত করেছিলেন, চাপ চাপ রঙের দ্বারা। আবার অন্য ছবিতে আলোকে তার সম্পূর্ণ জৌলুস নিয়ে হাজির করালেন। এসব চিত্রে বাদী রঙগুলিই সুস্পষ্ট ; একটার আঘাতে অপরটি অধিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শোনা যায় রোদের আলোয় গাছের পাতা ঝকঝক করছে দেখে, রবীন্দ্রনাথ নাকি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন ছবিতে ঐ রঙ ফলাবার জন্য গাছের পাতায় হীরে ঘসে দেবার। আর এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ দেবার জন্য ফুল পিষে রঙ তৈরি করতেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেন নি। স্মরণ করিয়ে দেয় ভ্যান গগকে, যিনি অনেক সময় তুলি ছেড়ে টিউব থেকে সরাসরি তাল তাল রঙ লাগাতেন ক্যানভাসের উপর। উভয়ক্ষেত্রেই, শিল্পীর অঙ্কনপদ্ধতি নেপথ্যের মনোভাবের অদম্য চঞ্চল passion

-কেই প্রকাশ করছে। অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি এক একটি ছোট লাভার টুকরো। অন্তরের উষ্মা, আবেগ, রাগ-অনুরাগের আগ্নেয়গিরির জলন্ত স্বাক্ষর এগুলি।

ইওরোপীয় শিল্পকলায়, ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীগোষ্ঠী আলোকে বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্যে বন্দী করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। দিনের বিভিন্ন সময় অনুসারে রৌদ্রের নানা রঙ, সবুজ মাটিতে ছায়ার সূক্ষ্ম মাত্রা আলোর সামান্যতম পরিবর্তনকে নিখুঁতভাবে পরিবেশনটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে অবিমিশ্র মূল রঙগুলির স্বাভাবিক দীপ্তি দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ১৯০৫ সালে 'ফোভিস্ট'দের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী এই রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে। প্রকৃতির খাম-খেয়ালী অনুসরণের দায়িত্ব থেকে রঙগুলিকে মুক্তি দেওয়া হল। প্রাথমিক উজ্জ্বল রঙের সাহায্যে আলোকে প্রকাশিত করা হল এমনভাবে যাতে চিত্র-ই আলো বিকীরণ করতে পারে। প্রকৃতির বর্ণনা নয়, বা রৌদ্রের আলোর ফটোগ্রাফিক অনুকরণ নয়; স্বাধীনভাবে রঙের সন্নিবেশে চিত্রাঙ্কনের পথ উন্মোচিত হল। মাতিস্-ব্রাকের এই আন্দোলনে স্বাধীন শিল্পসৃষ্টির অধিকারের স্বীকৃতি, গগ্যাঁ প্রবর্তিত primitivism-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু এর থেকেও আশ্চর্য, ফোভিস্টদের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির নেপথ্যের মনোভাবের অদ্ভুত সাযুজ্য। ইম্‌প্রেশনিস্ট চিত্রকলায় বন্দী রঙগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান ও ভারতীয় চিত্রে এতদিনের উপেক্ষিত উজ্জ্বল রঙকে তাদের আপন গুণের জোরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে একটা যেন মিলনসূত্র পাওয়া যায়। মাতিসের কয়েকটি কথা থেকে মতটা আরও সুস্পষ্ট হতে পারে: "Composition is the art of arranging in a decorative manner the diverse elements through which the painter expresses his feelings." আর রবীন্দ্রনাথের মতে: "ছবি জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে একটা form-এর harmony; রং-এর harmony-র সমাবেশে একটা expression-কে রূপ দেওয়া।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ) ছন্দের তালে রঙ ও রেখা বিন্যাসের চরিত্রটা স্পষ্ট; ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারও উভয়ের চিত্রেই পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রচিত্রে আলোর এই অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আনা হত রঙ ব্যবহারের নানাবিধ কৌশলে। এবং ছবি আঁকার পদ্ধতিতে, প্রচলিত টেকনিক-

বিরোধী রীতি-গ্রহণে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিল্পীদের পূর্বসূরী। পেনসিল ঘষে জমি তৈরি করার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও জলরঙে আঁকা ছবির বিশেষ বিশেষ অংশে তেল ঘষে তীব্র ঝলকানির ভাব আনতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। গাঢ় রঙে সমস্ত জমিটুকু ভরিয়ে দিয়ে, কাগজটির প্রয়োজনীয় অংশ-বিশেষে রঙ না লাগিয়ে সাদা রেখে দেবার প্রাচীন ভারতীয় কায়দাতেও, আশ্চর্য জোরালো দীপ্তি ফুটে ওঠে।

ছবি আঁকার ব্যাপারে কেবলমাত্র এই বেপরোয়া দুঃসাহসিকতাই নয়, সুচিন্তিত মতবাদের ভিত্তিও রবীন্দ্র-চিত্রকলাকে আধুনিক শিল্পকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানদখলের অধিকার দিয়েছে। ইওরোপীয় শিল্পজগতে ভ্যান্ গগ্, গগ্যাঁ ও পরে মাতিস-পিকাসোর নেতৃত্ব, ভাবপ্রকাশের তাগিদে, চিত্রাঙ্কনকে স্বাধীন সৃষ্টির পথে পরিচালনা করে আধুনিক চিত্রকলার গোড়াপত্তন করে। আমাদের দেশে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম, শিল্পীর এই স্বাধীন সৃষ্টির অধিকারকে স্বীকৃতি দেন এবং ভাবপ্রকাশের গুরুত্বের কাছে তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন।

ভারতীয় শিল্পে একসময় abstraction-এর একটা রেওয়াজ ছিল। বিশেষ কোনো বস্তু থেকে কেবলমাত্র তার একটি অঙ্গের আকৃতিকে নিষ্কাশিত এবং তাকে তার জনক বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুত করে, অন্যস্থানে প্রকাশ করার এই রীতিটির ভূরি ভূরি নিদর্শন মেলে প্রাচীন ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায়। বৃষের দেহ থেকে তার স্কন্ধের সাদৃশ্য নিয়ে আঁকা হত পুরুষের স্কন্ধ; হস্তিশুণ্ডের অনুকরণে অঙ্কিত হত স্ত্রীলোকের উরু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "আমাদের দেশের লোকেরা···ইচ্ছামত হাতী হইতে হাতীর সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া, কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এইজন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্রগমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটিকে একেবারেই দেখিতে পায় না।" দৃশ্যজগৎ থেকে আকৃতি ধার করার এই যে abstract পন্থা, রবীন্দ্রনাথ একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিচিত জীব-জন্তুর আকৃতির পরিবর্তে, তাদের সঙ্গে জড়িত ভাবানুষঙ্গকে বিমূর্ত করে প্রকাশে সচেষ্ট হলেন। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যে, বন-জঙ্গলের রহস্যটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাস্তবানুকরণের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে; মানুষের প্রতিকৃতিতে কখনও হাস্যরস, কখনও বিষাদ, কখনও ক্রোধ—এই ধরনের বিভিন্ন দ্যোতনাই বড়, শারীরিক সাদৃশ্য থেকেও। এবং জীব-জন্তুর ছবিতে দর্শককে নাড়া দেয় বীভৎসতার সুরটা; আকৃতিগত মিলের অভাবটা চোখে লাগে না। সুতরাং abstraction, প্রাচীন চিত্রকলার দৈহিক আকৃতির রাজ্য ছাড়িয়ে, রবীন্দ্র-চিত্রকলায় ভাবানুভূতির জগতে গিয়ে প্রবেশ করল।

কবিতাপত্র

ঈর্ষা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আমাকে যখনি ভাবো একা বসে কিম্বা ভিড়ে একা,
একাগ্র থাকে না মন পাশাপাশি কারো কারো মুখ
হৃদয়ের ভিত ধরে নাড়া দেয়। যদি হয় দেখা
জিজ্ঞাসা করেও জানি উত্তর পাব না। প্রেমে সুখ
থাকে না মুখর হলে। অভিমান উত্তর-বিমুখ ॥

আমাকে যে ভালো লাগে সে ভালোলাগার অন্ধকারে
বিবর্ণ চাঁপার বনে অন্য কারো লঘু কণ্ঠস্বর
দক্ষিণ বাতাসে কাঁপে। জানি তুমি তাই বারেবারে
দীর্ঘশ্বাস ফেল, প্রশ্ন যদি করি থাক নিরুত্তর
গত আর আগতকে মনে রেখে ভাঁটায় জোয়ারে ॥

কেন যে উত্তর চাই, কেন ভাবি অবরোহ পথে?
এ সব প্রশ্নের থেকে ভালোবাসা যদি মুক্তি পায়
প্রেমিক না হয়ে মন মুনি হবে প্রশান্তি-পর্বতে?
ও পথ প্রেমের নয়, প্রীত প্রেম অনাদি ঈর্ষায় ॥

সকাল : প্রার্থনা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সকাল। আকাশে জলে সম্মিলিত রৌদ্রের পুণ্যাহ।
অন্ধকার থেকে এসো, ফিরে এসো আমার কবিতা;
সংহত তরঙ্গে তুমি ভুলে যাও রাত্রির প্রদাহ
অনাবৃত অন্তরালে এসো দৃশ্যপুঞ্জ পরিবৃতা।

জানি, তুমি সঙ্কুচিত। অন্ধকার আশ্রয় তোমার,
প্রকাশ্য জগতে চক্ষু দগ্ধ হয় তীব্র দৃশ্যপটে
কিন্তু তাই শ্রেয়তর; কতক্ষণ বিদীর্ণ দুয়ার
নিঃসঙ্গ পবিত্র থাকে দৃপ্ত চক্ষু সূর্যের নিকটে?

আপাতত চক্ষু, গ্রীবা, কান্তিমান মুখ বক্ষদেশ
তুলে ধরো অনিবার্য বাতায়ন থেকে বহুদূরে,
দেখবে আকাঙ্ক্ষাগুলো আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরে
ক্রমশ উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, তীব্রতম, সহজ, অশেষ।
দেখবে কেমন করে আলোকিত তুমি, আমি, আর
আমাদের মধ্যবর্তী স্বেদ রক্তে মিলিত সংসার।

কিন্তু জানি, সাধ্যাতীত তোমার প্রকাশ্য আবির্ভাব।
তুমি স্বেচ্ছা-ভ্রাম্যমান বোধাতীত তিমির বিলাসী,
আমাদের চতুর্দিকে রক্তস্রোত বদলাবে স্বভাব
অপরিবর্তনযোগ্য তুমি স্তব্ধ আলোকবিনাশী।

ইতিমধ্যে আমি হব মৃত্যুহীন পতঙ্গের দাহ,
আবর্তিত বস্তুপুঞ্জে ক্ষমাহীন সূর্যের প্রবাহ ॥

ছুটপাল্লা

রণজিৎ দাশগুপ্ত

অনেক কথা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে
হঠাৎ দৌড়তে থাকে
যতক্ষণ না আলগা হাওয়া ঝাপট মেরে
এলোমেলো করে দেয়।

তোমার প্রশ্নতির্যক চোখের তারায়
স্মৃতি বিস্মৃতির পাতা
ওড়ে,
উড়তে উড়তে ঘরের আড়ায় দোল খায়।

আলোছায়ার টানাপোড়েনে
ঘরের প্রতিবিম্ব জলের পর্দায়
ঢেউয়ে দোলায় ভাঙতে ভাঙতে
স্থির।

কথা নেই
ছুটতে ছুটতে কখন বেদম হয়ে গেছে।

ভাবনাগুলো কিন্তু একে একে শব্দ হয়েছে।

দূরের জোরালো চীৎকারে
শব্দ অস্থির হয়ে ওঠে,
কথা হতে চেয়ে ঠোঁটের কার্নিশ ধরে
কাঁপতে থাকে।

জোর দমকা হাওয়ায় আমি ততক্ষণে
ছুট দিয়েছি
অগ্নিকোণে
কলকলরোলের আলোড়ন
যেখানে থৈ থৈ॥

সভা থেকে ফিরে

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

[কোন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে]

তারপর অনেক হাততালি জুড়ে জুড়ে
সভাপতি তৈরি হলেন,
অনেক সঙ্গতি সাজিয়ে গড়ে উঠল
সভা।
সারি সারি চিন্তার দেহ,
ঘরে ঘরে বাসি ফুলের মালা
মঞ্চে এলেন রবীন্দ্রনাথ ;
চারিপাশে আগুনের বেড়া,
মাঝখানে সাদায় কালোয়
গিল্‌টিকরা মুখ ;
দু চোখে ঠায় দৃষ্টি
তবু তখন অভ্যেস
দাঁড়িয়ে শুনতে, শুনতে, শুনতে
ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো।

সভাপতি আগেই সামিল,
সুতরাং ঝড় উঠল
কথকতার!
দুয়োরে দারোয়ান আর দুপুর,
বাইরে কোল-আলো-করা কত,
আরও কত দেবদূতের মেলা
পিঠ-ফিরিয়ে তবু।
রইল সবাই বসে।

অবশেষে,
পড়ন্ত রোদের মতো গাঢ় হলেন বক্তা
স্বর উঠল পঞ্চমে—
কানের মধ্যে বাজতে, বাজতে, বাজতে
তারপর কেমন যেন ফুরিয়ে গেল।

পাটে বসলেন সূর্য আর সভাপতি :
সঙ্গে সভায় তখন শুধু অন্ধকার
তাকিয়ে আছে
অচেনা ঐ সভাসদের দিকে,
দুচোখ যাঁর বরাভয়ের মুদ্রা
তাকেও দেখি আঁধারে মুখ লুকোতে।

বৃষ্টিতে অশ্বারোহী

পাবলো নেরুদা

প্রথম বর্ষণ এল, অবিরল দেয়াল বৃষ্টির, শিউলির
জনারের পাতা নুয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে ঘাত-প্রতিঘাতে,
এখন সমূহ তন্তু বিজড়িত ভিজে-ভিজে জাল,
বিন্দু-বিন্দু জলাধার, জঙলী মোচড়ে রুদ্ধ রাত,
বজ্রধ্বনি প্রতিধ্বনি দুঃখে ক্ষোভে আবর্তিত,
তির্যক উন্মত্ততায় বিদীর্ণ আকাশ।
প্লুতগতি অশ্বাবলী বর্ষণে নিহিত গন্ধ আনে ;
পদক্ষেপে প্রতিঘাতে আরক্তিম কেশর শাখায়
দ্রুত ছিন্ন-ভিন্ন করে বারিধার, পথের প্রস্তর,
এবং ঐ বাষ্পরাশি—বিকৃত-দুগ্ধাভ বাষ্পরাশি
জলেরই অনুচর
দূরে পলাতক বন্য পারাবতে ঘনীভূত
জলেরই ত্রস্ত সহচর।
কোথাও আলো নেই, শুধু অসহ কঠিন আবহাওয়ায়
অস্থির তৃণভূমির এই জলাধার ;
আর যত পায়ে-পায়ে তুরঙ্গের জান্তব সুগন্ধে
দ্রুতগতি বসুন্ধরা, সময়ের ত্রস্ত চলা শৃঙ্খলিত, এই বরষায়
আচ্ছাদন, অঙ্গসজ্জা, ঘনলালে পুঞ্জীভূত উরুপৃষ্ঠদেশে,
বারেবারে প্রতিঘাতে প্রকম্পিত করে সমূহ প্রান্তর রেখা,
দ্রুত নির্ধারিত রাখে, দিগ্বিদিকে প্রান্তরের সীমা।

দ্রুতপদে, পদক্ষেপে, ক্রমে দূর, আরো দূর ক্রমে,
ক্ষিপ্রপদে, পদক্ষেপে, দ্রুতপদে, পদক্ষেপে দ্রুত…
বৃষ্টিকে আঘাত হানে ঘোড়সওয়ার
বৃষ্টিতে, বর্ষায় যায়

তিক্ত আখরোট বনে ঝিরিঝিরি প্রকম্পিত সাপল রেখায়
বৃষ্টি তার সদ্যজাত চুমুরি বাঁকায়।
ঐ তো আলো, জলে, আলো, চকিত বিদ্যুৎ পাতায়-পাতায় ঢালে
আলোছায়া খেলা,
আর সমান মিলিত প্লুতছন্দে পাথাহীন জলোচ্ছ্বাস মাটি থেকে
জর্জরিত ফেরে।
ভিজে লাগাম, পোশাক, প্রশাথার মাতাল দোলন ;
পদক্ষেপ, পুনঃপুনঃ পদক্ষেপ, কুয়াশা অথবা চাঁদের আলোর মতো
ভাঙা নক্ষত্রের যেন নৈশ ক্ষেতখামার।
ঝড়ের মতো ঘোড়া, জমাট প্রেতের মতো, তীরের ফলকে ঢাকা,
উন্মাদনা সঞ্জাত সহস্র সজীব হস্ত
দোদুল্যমান আপেল সভয়ে বেষ্টিত, আর তার—
সমগ্র মহান সাম্রাজ্য ভীত পতাকাসহ।

অনুবাদক / মলয় রায়চৌধুরী

সাত্র´ ও কামু

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অনেক সমালোচকই সাত্র´ ও কামুর জীবনবেদের ঐক্য কোথায়, সেই অনুসন্ধানই করেছেন। তথ্যের জগৎ অনেকাংশে ঋজুকুটিল, অপরিচ্ছন্নতায় আবিল। ফলে ঐক্যের কামনা, পরিচ্ছন্ন সামান্যের স্তরে উৎক্রান্তি, অনেক ভাবুকেরই ইষ্ট। সাত্র´ ও কামুর দার্শনিক প্রত্যয় যে ভিন্ন, অনেকখানি বিপরীতধর্মী এ তথ্য অগ্রাহ্য করে অনেকেই তাই এঁদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই দুই শিল্পী-দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন, অন্তত মূল বিষয়ে। যে অর্থে সাত্র´ 'এক্সিস্টেন্‌সিয়ালিস্ট', সেই বিশেষ অর্থে কামু 'এক্সিস্টেন্‌সিয়ালিস্ট' নন।

সাত্র´ ও কামু, দুজনেই ফরাসীদেশের সাহিত্যজগতের দিকপাল। এবং দুজনেরই বিশিষ্ট জীবনবেদ খ্যাতি ও অখ্যাতি, দুইই অর্জন করেছে। অবশ্য দর্শনের রাজ্যে সাত্র´র স্বীকৃতি আরও ব্যাপক এবং সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে সাত্র´র প্রতিভাও উত্তোরোত্তর সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছে।

এই দুই শিল্পী-দার্শনিককে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সাধারণত গ্রহণ করা হলেও, এঁরা দুজনে নিজেদের মতানৈক্য বহু সময়ে জনসাধারণ্যে জ্ঞাপন করেছেন।

১৯৪৫ সালে সাত্র´র সঙ্গে কামুর প্রথম সাক্ষাৎকার। বছরখানেক পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কামু বলেন, "সাত্র´র এবং আমার নাম সব সময় যুক্ত হচ্ছে দেখে প্রতিনিয়ত বিস্ময় বোধ করেছি।" তিনি আরও বলেন, "তাঁর অতিখ্যাত এক্সিস্টেন্‌সিয়ালিস্ট দর্শনপ্রস্থানকে আমি বিশেষ পছন্দ করি না, এবং সত্য কথা বলতে কি, আমি মনে করি এই দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত।"

সাত্র´-দর্শনের মূল প্রত্যয় যেমন 'অস্তিত্ব' (existence), 'শূন্যতা' (nothingness), চিৎ-তত্ত্ব (being-for-itself) অচিৎ-তত্ত্ব (being-in-themselves), বিবমিষা (nausea), উৎকণ্ঠা (anguish), বিশ্বাসভঙ্গ (bad faith) ইত্যাদি, তেমনি কামুর দর্শনের মূল প্রত্যয় দুটি—১। অসম্ভব

প্রত্যয় (absurd) ২। বিদ্রোহ-প্রত্যয় (revolt)। মানবজীবনের স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে সার্ত্র, বিশেষ অর্থে, অসম্ভব প্রত্যয় (absurd) অবশ্য ব্যবহার করেছেন। দেকার্তের (Descartes) পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দ্বৈতবাদের (dualism) ভিত্তিতে অবস্থান করে, সার্ত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, চিত্তবস্তু (mind-substance) ও জড়বস্তু (body-substance), নিয়মশৃংখলিত প্রকৃতি ও মুক্ত, স্বতন্ত্র মনুষ্য-স্বভাবের মধ্যে আত্যন্তিক বৈপরীত্য আবিষ্কার করেছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে বলছেন, যে বাইরের কোনো উপকরণের ভারে মনুষ্য-স্বভাব শৃংখলিত নয় এবং সেই অর্থে মানবজীবন 'অ্যাবসার্ড'।

কামুর অ্যাবসার্ড-তত্ত্ব সার্ত্রের অ্যাবসার্ড-তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সার্ত্র নিজেই বলেছেন :

"কামু অ্যাবসার্ডকে যে কলঙ্ক (scandal) অর্থে নিয়েছেন, সেই অর্থে আমি 'অ্যাবসার্ড'কে স্বীকার করি না। শুধু তাই নয়, কামুর অ্যাবসার্ড-প্রতীতির সঙ্গে মিশে আছে মোহভঙ্গের প্রশ্ন (disillusionment), এই প্রশ্নও আমি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।"

দুই

'অ্যাবসার্ড' ও 'রিভোল্ট', এই দুটি প্রত্যয়ের সাহিত্যিক রূপায়ণই কামুর সাহিত্য-কৃতির মূল লক্ষ্য। সার্ত্র পূর্বাপর কামুর এই দুটি প্রত্যয় বর্জন করতে চেয়েছেন, অন্তত নৈয়ায়িক স্তরে।

বিদ্রোহ (revolt) প্রসঙ্গ আলোচনায় কামু বলছেন : বিদ্রোহ দুই বিশিষ্টরূপ : (ক) 'মেটাফিজিকাল' বিদ্রোহ (খ) রাজনৈতিক বিদ্রোহ। এই দুরকম বিদ্রোহের গুণাগুণ বিচার করে কামু 'মেটাফিজিকাল' বিদ্রোহের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

১৯৫১ সনে কামুর 'The Rebel' প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে কামু 'বিদ্রোহ' সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কামু বলেছেন যে রাজনৈতিক বিদ্রোহ (political revolution) শ্রেয়ের বিচারে অগ্রাহ্য। রাজনৈতিক বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা হয়তো মহৎই থাকে। আদর্শের শুভ্র, নিরঞ্জন রূপ দেখেই হয়তো বিপ্লবের অগ্নিযজ্ঞে অনেকেই আহুতি দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি গিলোটিন প্রয়োগে। এমনটি যে হবে, কামুর

কাছে তা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা, রাজনৈতিক বিদ্রোহে 'ইতিহাস' দেবতার আসন অধিকার করে। ফলে তথাকথিত ভবিষ্যতের পাদপদ্মে বর্তমানকে বলি দিতে হয়, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'যে কোনও উপায়' অবলম্বন না করে চলে না। বিপ্লবের ফলশ্রুতি এই যে স্বাধীনতা, প্রগতি, ন্যায়পরায়ণতা, সুখ, এই সব পদের অর্থবিভ্রাট ঘটে। স্বাধীনতা পরবশ্যতায় বিলীন হয় ; প্রগতির নামে প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছাচার প্রবর্তন করে ; ন্যায়পরায়ণতা ও সুখ যে ইষ্ট, এই মূল্যবোধ বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে মহতী বিনষ্টি লাভ করে।

ইতিহাসের গতিপথ এক ধ্রুব লক্ষ্যে ন্যস্ত, পথে হয়তো বিকীর্ণ রইল রক্তাপ্লুত, নিষ্পেষিত শবের স্তূপ, তবুও জগন্নাথের রথ অগ্রসর হবেই অমোঘ নিয়মে, এ হেন অনিবার্য ঐতিহাসিকতায় কামুর আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। ফলে 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' কামুর পক্ষে গ্রহণীয় নয়। কামু ইতিহাসের স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছেন প্রকৃতিকে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বিলীয়মান মূল্যবোধকে কামু বরণীয় বলে মনে করেছেন। সেই মূল্যবোধে ভ্রাতৃত্ব (fraternity), স্বকীয় মহিমা, (dignity) আপেক্ষিকতা (relativity) এবং সংযমই (moderation) মৌলিক উপাদান।

তিন

একথা উল্লেখযোগ্য যে, সার্ত্র মার্কস্‌বাদী নন এবং দার্শনিক দিক থেকে বহু মূল বিষয়ে তিনি মার্কস্‌বাদ-বিরোধী। তবুও কামুর বক্তব্য তিনি পুরোপুরি বর্জন করেছেন। সার্ত্রের মতে 'মেটাফিজিক্যাল বিদ্রোহ' আসলে বিদ্রোহাভাস। মেটাফিজিক্যাল বিদ্রোহী সমাজের গ্লানি দূরীভূত করতে ইচ্ছুক নন। বরং এ দায়িত্ব গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক। কেননা, সমাজ যদি গ্লানিমুক্তই হয়ে ওঠে, তাহলে এই বিদ্রোহীর সেন্টিমেন্টাল বিদ্রোহের পরিবেশই যে আর থাকে না।

সার্ত্র সাধারণভাবে রাজনৈতিক বিদ্রোহের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কেননা যে সমাজকে সমন্বিত, শোভন বলা চলে না, সেই সমাজের পুনর্বিন্যাসই রাজনৈতিক বিদ্রোহীর কাম্য। এই কামনার সঙ্গে মিশে আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ; মুক্ত, স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার দ্যুতিময় প্রকাশ। বিদ্রোহ-কামনা বাস্তবে রূপ পাবে কর্মযোগের মাধ্যমে। ব্যক্তিসত্তার দায়িত্ববোধ মূর্ত হবে রাজনৈতিক বিদ্রোহের কঠিন বন্ধুর বাস্তবে।

ফ্যাশিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সার্ত্র এক সময় 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' প্রায় স্বীকার করেছিলেন। কামুর মন ও মেজাজের সঙ্গে বোধ হয় সে কারণেও সার্ত্রর পার্থক্য সর্বাধিক। সার্ত্র বলেছেন যে, মানুষ যদি তার উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়, আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে ইতিহাসের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে (entering history)। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কর্মযোগে তাকে অংশ নিতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে হাঙ্গেরী-অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সার্ত্র যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছিলেন তা মূলত রাজনৈতিক। এবং এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট দর্শনের যোগাযোগ প্রায় অপ্রত্যক্ষ। সার্ত্র বলেছিলেন যে, ফরাসী দেশে সাম্যবাদী দলই শ্রমিক-শ্রেণীর একমাত্র কার্যকরী দল। সৎ-বুদ্ধি, ইতিহাস-অনুপ্রাণিত, সব বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরই তাই কর্তব্য হল এই দলের সহায়তা করা। কামু যখন সার্ত্রর বিরুদ্ধে দার্শনিক নীতিভ্রষ্টতার অভিযোগ আনলেন, বললেন যে, অস্তীতিবাদী দর্শনের মৌল বিশ্বাসের সঙ্গে সার্ত্রর রাজনৈতিক বক্তব্য সঙ্গতিহীন তখন সার্ত্র জবাবে বললেন : কথাটা একদিক থেকে ঠিকই। তবে এই মর্ত্যের মাটিতে এবং এই সময়ে ইষ্টানিষ্ট অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত—but "on this earth and at this time, good and evil are inseparable."

চার

সার্ত্র ও কামুর জীবনবেদ আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুই শিল্পী-দার্শনিকের চৈতন্য-বৈপরীত্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সার্ত্র নীতিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন, ইষ্টানিষ্ট জিজ্ঞাসা সার্ত্রর নিত্যসহচর। তবুও তিনি মুখ্যত মেটাফিজিসিয়ান। এবং এ মেটাফিজিকস্ "is not a sterile discussion about abstract notions which have nothing to do with exprience. It is a living effort to embrace from within human condition in its totality." কামু মেটাফিজিকসের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দর্শনজিজ্ঞাসাও কামুর আছে, তবুও তিনি একান্তভাবেই নীতিশাস্ত্রবিদ্। সার্ত্র নৈয়ায়িক। কামু কাব্যধর্মী চিত্তপ্রাধান্যবাদী। এবং সব থেকে বড় কথা হল : সার্ত্র রাজনৈতিক মতবাদ-প্রবক্তা, কিন্তু কামু মুখ্যত শিল্পী।

সার্ত্র ও কামুর বৈপরীত্য নানাদিক থেকে দেখানো সম্ভব। তবে যে সব সমস্যা নিয়ে এই দুই শিল্পী-দার্শনিক মনন করেছেন, সেই সব সমস্যাগুলির মধ্যে এ তিনটি উল্লেখযোগ্য :

১। রাজনীতিতে নৈতিক শুদ্ধতার স্থান কোথায় ?

২। রাজনৈতিক কার্যকারিতার মানদণ্ড কি ?

৩। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের স্বরূপ কি ?

পাঁচ

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সার্ত্র ও কামুর বিপরীত জীবনবোধ থেকেই উদ্ভূত। সার্ত্র সমাজের বিকৃত, অশান্ত রূপ দেখে ক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক কর্মকুশলতা প্রয়োগ করে সমাজকে শোভন ও সুন্দর করে তোলার সম্ভাবনায় সার্ত্রর বিশ্বাস অপরিসীম। এই জীবনধর্মী আবেগ থেকে সার্ত্র মনে করেছেন যে সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর কাম্য।

সার্ত্র জানেন যে বিপ্লবী রূপান্তরের পথ সরল, ঋজু নয়। এই পথ চলার বিপদ আছে, দুঃখ আছে, অভিশাপ আছে। অন্যায়, অবিচার ও নীতিভ্রষ্টতা এই পথ পরিক্রমার সাক্ষী হতে পারে। তবুও ঐতিহাসিক কর্মোদ্যোগের মাধ্যমেই যে মূল্যের—শ্রেয়ের সৃষ্টি এ বিষয়ে সার্ত্র স্থিরনিশ্চয়। সার্ত্র নৈতিক শুদ্ধতার প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক উপযোগিতার পটভূমিকায় আলোচনা করেছেন। ফলে নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি উপযোগিতাবাদের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। সার্ত্র বলছেন : "The business of any morality is to consider human life as a match which can be won or lost, and to teach men how to win।"

কামুর মানসিক প্রবণতায় মূল্যের—শ্রেয়ের আশ্রয় রাজনৈতিক কর্ম নয়, শুদ্ধ ব্যক্তিচৈতন্য। ঐ ব্যক্তিচৈতন্য কর্মাশ্রয়ী কিংবা ইতিহাস-আশ্রয়ী নয়। শ্রেয়ের অস্তিত্ব অনুভববেদ্য এবং ইতিহাস এই অস্তিত্বের হ্রাসবৃদ্ধি করতে একান্তই অক্ষম। অর্থাৎ কামু রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের তাদাত্ম্য স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ। রাজনীতির তৎকালীনতার দাবিতে নৈতিক শুদ্ধতার হানি হবে, ঐ পরিস্থিতি কামুর একেবারেই অসহ্য। সংক্ষেপে তাই বলা চলে : সার্ত্র রাজনীতিকে মুখ্য করেছেন ; কামু নিত্য, শুদ্ধ নৈতিকতায় বিশ্বাসী।

রাজনৈতিক কার্যকারিতার প্রশ্নে সার্ত্র বলেন যে স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা

রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই লক্ষ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজন সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য স্থাপন। শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য পুনরায় যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটি হল সমাজ-বিপ্লব। এবং সমাজবিপ্লবের উপকরণ হচ্ছে সাম্যবাদী দল। সার্ত্র তাই অনেকদিন মনে করেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য স্থাপিত না হলে সমাজরূপান্তর অসমাপ্ত থেকে যাবে। রাজনীতিও বন্ধ্যাত্ব অর্জন করবে। স্বাধীনতার স্বপ্নও সফল হবে না কোনোদিন। কামুকে উদ্দেশ করে সার্ত্র তাই লিখেছিলেন :

"Our freedom to-day is nothing but the free choice of fighting to become free. You see, it is not a question of caging my contemporaries; On the contrary, it is a question of uniting with them to shatter the bars. For we too, Camus are caged, and if you really want to prevent a people's movement from degenerating into tyranny, don't begin by condemning it out of hand……

"To deserve the right to influence men who struggle, you must first take part in their struggle।"

কামুর চিত্তলোকে স্বাধীনতার সমস্যাই মুখ্য। রাজনীতি তখনই কার্যকরী হবে যখন রাজনীতির (কিংবা বিপ্লবের) রূপ সদাচারভ্রষ্টতা কিংবা সুবিধাবাদের স্থূল হস্তাবলেপ পরিহার করে অগ্রসর হতে পারবে। কোনো মালিন্য, কোনো সুবিধাবাদ যদি বিপ্লবের রূপ আবৃত করে, স্বাধীনতার অদম্য আগ্রহ যদি বিপ্লবী রাজনীতির প্রেরণার সঙ্গে মিশে একাকার না হয়ে যায়, তবে সে বিপ্লব হবে তুচ্ছ। তার না থাকবে মহিমাময় রূপ, না থাকবে কার্যকারিতা। কামু বলেছেন : বিপ্লবের রূপ চিরভাস্বর। এই ভাস্বর রূপের নিদিধ্যাসনই রাজনীতিকে তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করতে পারে। নীতিভ্রষ্টতার অভিশাপ থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করে, নিষ্কাম কর্মযোগে উত্তীর্ণ হওয়াই কামুর মতে, জীবনের শ্রেয়।

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও সার্ত্র ও কামুর প্রত্যয় ভিন্ন। সার্ত্র বিভিন্ন লেখায় মার্কস্‌বাদ ও এক্সিস্টেনসিয়ালিজমের সগোত্রতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, অন্তত কর্মের ক্ষেত্রে। যদিও দার্শনিক দিক

থেকে মার্কস্‌বাদ ও এক্সিস্টেনসিয়ালিজমের বৈপরীত্যই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং যদিও সার্ত্র মার্কস্‌বাদকে 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ হিসাবে স্বীকার করেন নি, তবুও নানা নিবন্ধে সার্ত্র মার্কস্‌বাদ ও সাম্যবাদী দলের দরদী হিসাবে জনসমক্ষে এসেছেন। সার্ত্রর সমাজচেতনা, ইতিহাসবোধ, বিপ্লবী রূপান্তরে বিশ্বাস, সার্ত্রর নাস্তিকতা ও মানবতাবাদ, এ সবই মার্কস্‌বাদের সঙ্গে সার্ত্রর আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করেছে। কামু বলছেন যে, সার্ত্রর দর্শন মার্কস্‌বাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঐ আত্মীয়তা সুবিধাবাদ থেকেই সৃষ্ট। কামু আরও বলছেন : সার্ত্র যদি হৃদয়াবেগ বর্জন করে নিজস্ব দর্শনের চিত্তভূমিতে স্থিত হতে পারতেন, সত্যানুসন্ধানই যদি তাঁর একান্ত ইষ্ট হত, তাহলে তিনি স্বীকার করতেন যে, মার্কসবাদ ও অস্তীতিবাদের বৈপরীত্যটাই প্রধান কথা। মার্কস্‌বাদ বলে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অমোঘ—অনিবার্য। অস্তীতিবাদ বলে যে ইতিহাসের ধারা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ইচ্ছার (free choice) সমষ্টি দিয়ে গাঁথা। মার্কসবাদ বলে, বিচিত্ররূপরূপিনী প্রকৃতির ক্রমবিকাশের নিয়মে ইতিহাস শৃংখলিত। অস্তীতিবাদ বলে যে, ইতিহাসের গতি স্বচ্ছন্দ, মুক্ত, অনির্দিষ্ট। কামু অনুযোগ করেছেন যে, নির্যাতিত মানবতার নামে সার্ত্র দার্শনিক প্রজ্ঞা বর্জন করেছেন এবং মার্কস্‌বাদ ও অস্তীতিবাদের সমন্বয় সাধনের অসাধ্য কাজ হাতে নিয়েছেন।

ছয়

সার্ত্র ও কামুর মতপার্থক্য স্বতন্ত্র জীবনোপলব্ধি থেকে প্রবাহিত। রাজনীতির দর্শনে ও নীতিশাস্ত্রের প্রশ্নে দুজনে স্বতন্ত্র পথেরই পথিক। যে মূলনীতির প্রশ্ন সর্বকালের, অর্থাৎ "মানুষের পরমশ্রেয়ঃ কি", সেই প্রশ্নই এই দুই শিল্পী-দার্শনিকের জিজ্ঞাসায় প্রকট। প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই : যা প্রয়োজনীয় বা যার উপযোগিতা আছে তাই কি মানুষের শ্রেয় ? উপযোগিতা ও মূল্য কি সমার্থবাচক ?

সার্ত্র মার্কস্‌বাদ গ্রহণ না করেও বাস্তব মানব-পরিস্থিতির নামে উপযোগিতাবাদী (pragmatic) সদাচার প্রায় গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক স্তরে তিনি স্বীকার করেছেন যে জীবনের তাৎপর্য নির্ণয়ের বেলায় কোনো বাস্তব সাধারণ সূত্র প্রতিপাদন করা কিংবা সর্বজনগ্রাহ্য কোনও রাজনৈতিক

কর্মসূচী প্রণয়ন করা বিশ্বাসভঙ্গেরই (bad faith) নামান্তর। তবুও কার্যকালে তিনি স্বকীয় রোমান্টিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ বর্জন করে স্থূল ইউটিলিটেরিয়ানিজমেরই আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তাঁকে বলতে হয়েছে, নৈতিকতার কাজ হল জীবনের খেলায় জয়লাভে সাহায্য করা, যদিও এ বক্তব্য সার্ত্র র অস্তীতিবাদের মূল প্রতিজ্ঞার সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিবিহীন।

একথা নিঃসন্দেহ যে সার্ত্র র নৈয়ায়িকসিদ্ধি কামুর তুলনায় বৃহত্তর। কিন্তু সঙ্গতির ও নীতির প্রশ্নে কামুর শুদ্ধতা অপাপবিদ্ধ। হয়তো সেই কারণেই যদিও সার্ত্র একদা কামু প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"This Descartes of the Absurd refused to leave the safe ground of morality and venture on the uncertain paths of practicality" এবং "He was in this century, and against history" তবুও পরবর্তীকালে সার্ত্র কামুর সপ্রশংস নব মূল্যায়ন করে লেখেন :

"His was also a reaffirmation at the heart of our epoch, of the existence of the moral fact, against the Machiavellians."

বেঙ্গল স্পেক্টেটর ও ইয়ং-বেঙ্গল

অমর দত্ত

এক

'পার্থেনন', 'জ্ঞানান্বেষণ', হিন্দু-পাইওনীয়ার', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'—ইয়ং বেঙ্গলের এই চারটি মুখপত্রের মধ্যে বেঙ্গল স্পেক্টেটর ছাড়া অন্যগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।

ইয়ং-বেঙ্গলের সর্বশেষ মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। এই মুখপত্রে এক-দিকে যেমন ইয়ং-বেঙ্গলের পরিণত চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে, অন্যদিকে বাঙলা রেনেসাঁসের সামগ্রিক ধারার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ইঙ্গিত ধরা পড়েছে। এই মুখপত্রে প্রাথমিক জাতীয় চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের বাহন করার স্বীকৃতি প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুখপত্রটিতে কয়েকটি পত্র আছে—পত্রগুলি ভাবের দিক দিয়ে ইয়ং-বেঙ্গলের ভাবকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন—সেইদিক দিয়ে মুখপত্রে প্রকাশিত পত্রগুলি ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের লিখিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দেশের বস্তুগত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বেঙ্গল স্পেক্টেটরে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাদানের দাবি করা হয়েছিল।

জনৈক ইয়ং-বেঙ্গলের পত্রে জানা যায় যে ১৮১৪ সালে মিশনারীরা নিজেদের প্রচারকার্যের জন্য ৯৬,৯৮৮ টাকা খরচ করেছিল, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৯৬,১৮৪ টাকা। প্রচারকার্যের জন্য ঐ অর্থের অধিকাংশ আসত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে। পত্রলেখক উভয় বিষয়েই এদেশের জনগণকে সচেতন করে দেন। এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ প্রাথমিক জাতীয় চেতনার সৃষ্টির পূর্বে সম্ভব নয়। স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা না থাকলে এই চেতনার জন্ম অসম্ভব।

মুখপত্রটিতে ১৮৪২ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর থেকে মিয়াজান নামে এক রায়তের উপর হুগলী জেলার জমিদারের অত্যাচারের বর্ণনা কয়েক সংখ্যা ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি পরিবেশনার মধ্যে ইয়ং-বেঙ্গলের মানবিক

দৃষ্টিকোণটি এবং রায়তদের প্রতি তাঁদের দরদী মনটি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জমিদার নিজের খেয়ালখুশী মতো মিয়াজানের দেয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। মিয়াজান জমিদারের এই খামখেয়ালী মনোভাবের প্রতিবাদ করলে তার উপর বর্বরোচিত অত্যাচার হয়। মিয়াজান কালেক্টর সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করলে বিচারের এক চূড়ান্ত প্রহসন চলে এবং অসহায় মিয়াজান জমিদারের অত্যাচারের বলি হয়। মিয়াজান যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখে শিকার মাত্র—সেই সমাজব্যবস্থায় তার পরিচয় এর চেয়ে বিন্দুমাত্র বেশী ছিল না।

১৮৪৩ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় জনৈক ইয়ং-বেঙ্গলের পত্রে সামাজিক বিদ্রোহের স্বর প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছে। পত্রটির কিয়দ অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "Whatever might have been the object of the revered sages that widows must never marry—the law when we consider its severity toward the unfortunate females for its demoralising effect on society at large, must be declared unwise and sevage.

"To procure the abolition of this law, to legalise the marriage of the widows and to make the laws recognise the issue of such marriage as legitimate heirs to their ancestors, will be an act of glorious chivalry, and the sign of the first step of an advancing civilisation in this land of darkness and barbarity !" এই পত্রটির মধ্যে যুগধর্মকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যুগধর্মকে স্বীকার করার অর্থ বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে নবজাগরণ যুগের হিউম্যানিস্টদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। যার মূলে মানুষকে তাঁরা তার মানবিক সত্তার স্বীকৃতির মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। একটি যুগের সুচিন্তা অন্য একটি যুগের সুচিন্তা হবে এমন কোনো কথা নেই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তার রূপ ও স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে—তাই অতীতের সুচিন্তাকে মেনে নিলে সেই চিন্তা ভূতের মতো সমাজমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নারীর অধিকারকে খর্ব করার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ—কিন্তু আজকের যুগে নারীকে বন্ধনমুক্ত হতে হবে। শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য

শাস্ত্র—তাই ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় শাস্ত্রকে দূরে রেখে নারীর মানবিক মহিমার প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন। কেননা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে নারীর মুক্তির মধ্যে সমাজজীবনের অগ্রগতির শক্তি নিহিত আছে। তা না হলে যে নারীকে আমরা পিছনে ফেলে রাখব, সেই নারী আমাদের পিছনে ঠেলে দেবে।

ইউরোপের বণিক-সভ্যতার অভ্যুত্থানে যে হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ দেখা দিয়েছিল উদারনীতিবাদ তারই ফলশ্রুতি। এই উদারনীতিবাদের চেতনার গুণেই মানুষকে তার অখণ্ড মানবিক সত্তায় প্রস্ফুটিতরূপে দেখার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। ইয়ং-বেঙ্গলের মধ্যেও এই চেতনাটি খুব সুস্পষ্ট। মরিশাসে ইক্ষু চাষের জন্যে কুলী চালানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়। ডেভিড হেয়ারও এই কুলী চালান দেওয়ার বিরুদ্ধতা করেছেন। কুলীদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে এজেন্টরা কুলী চালান করত। সেই দ্বীপে ভারতীয় কুলীদের মানুষের মতো বেঁচে থাকার পরিবেশ ছিল না। ১৮৩৯ খ্রীঃ ১৪ নং আইন অনুসারে প্রবঞ্চনা করে কুলী চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে এক আইন পাশ হয়। Dr. Grant-এর অধীনে মরিশাস থেকে পালিয়ে-আসা কুলীদের সাক্ষী দেওয়ার জন্যে এক কমিটি তৈরি হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে ওঠে নি। তার কারণ হল, সাহেবমাত্রই কুলীদের কাছে এক প্রচণ্ড ভীতি স্বরূপ ছিল। সাহেবদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার মতো বিন্দুমাত্র নৈতিক সাহস কুলীদের ছিল না। কুলীরা নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তা করার মতো মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করতে পারেন নি। কুলীদের অন্তত মানুষের মতো বেঁচে থাকার অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করে বেঙ্গল স্পেকটেটরে লেখা হয়েছিল: "We hope no attention will be wanting on the part of the legislative and executive authorities in seeing that no force or fraud is practised on the labouring population to be exported for Mauritus—that they fully understand the nature of the engagement they will have to enter into—that they be, suject to no sort of ill treatment at sea or in Mauritus and that they receive every protection for the injury which may be inflicted on them."

রামমোহনের প্রবল যুক্তি এবং এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইচ্ছার চাপে পড়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮৭ ধারায় এদেশীয়দের উচ্চ সরকারী পদসমূহ লাভ করার সমস্ত অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয়। কিন্তু উচ্চতর রাজপদগুলি লাভ করার ব্যাপারে সবচেয়ে সুগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলেন ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়। এর কারণ হল, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং রাজপদগুলি লাভ করার মতো যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের ছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ থেকে ১৮৪৩ খ্রীঃ পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয়ই উচ্চতর রাজপদগুলি লাভ করতে পেরেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে অভিযোগ করা হত যে নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে দেশীয়রা উচ্চতর রাজপদগুলি লাভ করার অযোগ্য। বেঙ্গল স্পেকটেটরে বিভিন্ন সময়ে দেশীয়দের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের বেঙ্গল স্পেকটেটরে এই প্রসঙ্গে সদর দেওয়ানীর রিপোর্টটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, ১৬৭ জন দেশীয় প্রধান সদর আমীনের মধ্যে ১৩২ জন Good—২২ জন Tolerable এবং ১২ জন Bad and Dismissed। ১২৯ জন সদর আমীনের মধ্যে ৯১ জন Good—২৪ জন Tolerable এবং ৬ জন Bad and Dismissed.

১৮৪২ সালের ১লা অক্টোবরে জনৈক ইয়ং-বেঙ্গলের দেশীয়দের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে মন্তব্য আছে, "That these ill paid officers are generally corrupt, is not therefore, the result of native character, but of the system adopted by the government, and nothing but a liberal pay can reform the evil"। দুর্নীতি দমনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে আজও ঠিক একই দাবি ওঠে। অতি আধুনিক যুগের চিন্তাতে মানুষকে স্বভাব অসৎ হিসেবে দেখানো হয় না, পরিবেশ মানুষকে অসৎ করে বলে মেনে নেওয়া হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজসম্পর্কের বেড়াজালে বাস করে এই রকম মানবমুখিন বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল।

১৮৪২ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের পথে অযৌক্তিক বাধা সৃষ্টির বিরোধিতা করে বলা হয় যে :

১। এদেশের ভাষা, স্বভাব, রীতি প্রভৃতির সঙ্গে অপরিচিত ইংরেজ সিভিলিয়ানরা কখনোই যোগ্য শাসক হতে পারেন না।

২। ইংরেজরা এদেশের মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন—ফলে সৎ মানুষদের পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা চাটুকারদের দ্বারা পরিচালিত হন।

৩। হেলিবেরি কলেজের ব্যয় প্রচুর এবং ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বেতনও প্রচুর। কোম্পানী ভারতীয় সিভিলিয়ান নিযুক্ত করে অনেক কম খরচে অনেক সুনিপুণ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

১৮৪২ খ্রীঃ আগস্ট মাসের সংখ্যায় সদর আমীন, কালেক্টর, মুন্সেফ প্রভৃতির কর্মালয়গুলি প্রকাশ্য স্থানে হওয়ার দাবি জানানো হয়—কেননা তাঁরা অনেক সময়ে নিজেদের বাড়িতে অফিস করে বিচারব্যবস্থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যেতে চাইতেন। এই চিন্তাটি রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ।

সাংবাদিক হিসেবে ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক চেতনা বা World Outlookটি বেঙ্গল-স্পেক্‌টেটরে আছে। ১৮৪২ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর তারিখের সংখ্যায় আফিং-যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—"It is reported that owing to the instigation of the Emperor, and the better to succeed in getting the treaty confirmed the sooner, Sir Henry Pollinger had promised to prohibit English vessels importing drug into any of the five ports named in the treaty under a penalty of confiscation. How will the British Indian Government, the holders of opium monopoly, relish this prohibition ?" 'World outlook' না থাকলে সন্ধি শর্তটির অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার কেমন করে এই নিষেধাজ্ঞার রসাস্বাদন করবে ? প্রশ্নটি যেমন একদিকে ব্যঙ্গময়, অন্যদিকে ঠিক তেমনি সচেতনতার পরিচায়ক।

নবজাগরণ যুগে পোপ এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপের দেশগুলি জ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে—এর ফলে এই যুগে জাতীয় ভাষা শিক্ষার বাহন হয়েছে। বুর্জোয়া চিন্তাদর্শে বিশ্বাসী ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন করতে চেয়েছিল। তাঁরা অনুভব করেছেন যে শুধু ইংরেজী শিক্ষাকেই মূলধন করলে চলবে না—জ্ঞানের বিস্তারের জন্যে, পুরনো সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার জন্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান একান্তই প্রয়োজনীয়। ১৮৪২ খ্রীঃ

৯ই আগস্টের সংখ্যায় বলা হয়েছে, "The enlightment of the natives can be only effected through the medium of the vernacular language, the language of their infancy with which their earliest thoughts and associations are entwined". মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়ের যুগে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল বিজ্ঞান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মনৈতিক চেতনা একদিকে যেমন জীবনের সামগ্রিক চেতনাকে দুর্বল করে দেয়, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকে রুদ্ধ করে। কেননা সবল জীবনবোধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সামাজিক শক্তি মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রভু ও ধর্মীয় নেতাদের হাত থেকে বহুর হাতে চলে যায়। ধর্মনৈতিক সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনাকে শক্তিময় করে তোলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য মাতৃভাষার বিকাশ ইউরোপে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল ; এদেশেও সেই দাবির প্রতিধ্বনি তুলেছেন ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বণিকসভ্যতার পথিকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে আরো বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখেছেন এবং নিজেদের ভাবাদর্শকে সামাজিকের মনে দৃঢ় করার জন্যে মাতৃভাষার শক্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় ও বাঙলা নবজাগরণের আরো অনেক পথিকেরা ইউরোপের জাতীয়তাবাদী জীবনচেতনার এই মূল্যবোধকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থাৎ করতে পেরেছেন।

দুই

ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের প্রত্যক্ষ সহায়ক ইংরেজ-সৃষ্ট সামন্তপ্রভু প্রায় কেউই ছিলেন না, অন্তত ইয়ং-বেঙ্গলের সৃষ্টিমুহূর্তে নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্রের দিক দিয়ে কেউ কেউ হয়তো ছোট-খাট জমিদার ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় মূলত ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণী ছিলেন ; এটাই তাঁদের প্রধান অর্থনৈতিক শ্রেণীচরিত্র। ইউরোপের বণিকসভ্যতার জীবনচেতনার মূল্যবোধের উপলব্ধি তাঁদের ধ্যানধারণায় বিপ্লব আনলেও নতুন অর্থনৈতিক

শ্রেণীচরিত্র লাভ করার কোনো উপায়ই তাঁদের ছিল না। এই সীমাবদ্ধতা তাঁদের ট্র্যাজেডি, শুধু তাঁদেরই নয়, জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাঙলা নবজাগরণের সমস্ত পর্যায়েই এই সীমাবদ্ধতা অল্প-বিস্তর ক্রিয়াশীল।

ইয়ং-বেঙ্গলের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকুটেটরের মধ্যে প্রাথমিক জাতীয় চেতনার চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট। প্রাথমিক জাতীয় চেতনা বলছি, কেননা এর মধ্যে ইংরেজদের ভারত ত্যাগের ভাবী দাবিটি খুব অস্পষ্ট অথচ খুব সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক জাতীয় চেতনার পিছনে দেশপ্রেম ছিল কিন্তু সেই দেশপ্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। বণিকসভ্যতার জীবনচেতনার একটি ফল দেশপ্রেম—এই দেশপ্রেম সামন্তসভ্যতার সামন্তপ্রভুদের জন্যে নয়, সমগ্র দেশবাসীর জন্য। বণিকসভ্যতার দেশপ্রেমের সঙ্গে পরিচিতিই ইয়ং-বেঙ্গলের মনে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সন্ধানে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেই স্বরূপ সন্ধানের অনুপ্রেরণা তাঁদের সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রীতি ও আত্মিক বন্ধনের যোগসূত্র রচনা করেছে। দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করতে চান কেননা তাতে জাতির মানসিক মৃত্যু ঘটে ; কিন্তু দেশের কুসংস্কার দূর করার জন্যে পাদরীদের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাতে রাজী নন—কেননা তাতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর রাজস্ব থেকে সংগৃহীত অর্থ জনগণের মঙ্গলে ব্যয়িত না হয়ে ধর্মপ্রচারের বাহন হবে এ তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারকে ঘৃণা করেছেন কিন্তু কুসংস্কারে বদ্ধ এদেশের অগণিত মানুষকে ঘৃণা করতে পারেন নি। ইউরোপের বণিকসভ্যতার শক্তি সঞ্চয়ের যুগে ধর্মনীতি যেমন যুগপ্রয়োজন ও বিভিন্ন জাতির মুক্ত জীবনদর্শনের অনুশীলনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে, এদেশের ধর্মনৈতিক চেতনাও অনুরূপ যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সন্ধি করে চলুক—একথা ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় কামনা করেছেন। ইয়ং-বেঙ্গলের কামনা ছিল যে নতুন জীবনদর্শনের আলোয় পুরাতন ধর্মনৈতিক চেতনার শাসন ম্লান হয়ে যাক, ঠিক যেমন করে পোপের শাসন নবজাগরণের যুগে ইউরোপ থেকে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। দর্শনের ইতিহাসে 'কমনসেন্স স্কুল' নামে পরিচিত বিশেষ পদ্ধতিটি প্রধানত স্কটিশ দার্শনিকদের দান। সেখানে র‍্যাশনালিজম্ (যুক্তিবাদ) ও এমপিরিসিজম্ (অভিজ্ঞতাবাদ)-এর সমন্বয় ঘটেছে। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের এই বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। বিধবা-বিবাহ কিংবা অন্যান্য কুসংস্কারগুলির সমস্যা

ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে বুঝ চেয়েছেন—ভারতবর্ষের মনন-ধর্মিতার পথ—অর্থাৎ সনাতন ধর্মের ম মূল্যায়ণের পথে তাঁরা যান নি। এই দিক দিয়ে তাঁরা বাঙলার নবজাগ পথিকদের থেকে স্বতন্ত্র বললে বোধ হয় খুব বেশি বলা হবে না, কিং একেবারে ভুল বলা হবে না।

ইংরেজ-শাসন তাঁদের কাছে নতুন জীবনদর্শনের মূল্যবোধ এনে দিয়ে এর জন্যে তাঁরা ইংরেজ-শাসনের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই মূল্যবোধ লা করে তাঁরা ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের বণিকসুলভ মনোভাব সম্বন্ধে সচে হয়েছেন। অথচ নতুন জীবনদর্শন লাভের কৃতজ্ঞতা ও ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের পিছুটান সৃষ্টি করেছে। এইজন্যে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা সমালোচক হয়েও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের কথা তাঁরা বলতে পারেন নি তাই ইয়ং-বেঙ্গলের জাতীয় চেতনার পথ বেয়ে-আসা রাজনৈতিক চেতনাটি সীমাবদ্ধ। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে দেখতে গিয়ে তাঁরা প্রতিমার দ্বার আচ্ছন্ন ও ঝোঁকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন—বেঙ্গল স্পেকটেটরে তাঁদে ভূমিকা অনেকটা ইংলণ্ডের বিরোধীদলের মতো। এই সীমাবদ্ধতার জন্যে ইয়ং-বেঙ্গল বিপ্লবাত্মক পথে যেতে পারেন নি। ইউরোপের বুর্জোয়া ব বণিকসভ্যতার ফলশ্রুতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোয় ইয়ং-বেঙ্গলের মন উদ্ভাসি হলেও তাঁরা জমিনির্ভরতা ত্যাগ করতে পারেন নি। এই মনন-ধর্মিতার ঠি পাশেই জমিনির্ভরতা ইয়ং-বেঙ্গলের স্বাভাবিক পরিণতিকে ব্যহত করেছে।

ডিরোজিও আত্মসচেতন পর্যবেক্ষণ ও আরোহ রীতি—এই দুইটি পাশ্চাত্ত রীতির বৈশিষ্ট্যে তাঁর ছাত্রদের দীক্ষিত করেছিলেন। দেশ ও জাতি সম্বন্ধে ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকটেটরে এই দুই রীতির প্রয়োগের প্রচেষ্টা আছে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ে তাঁদের কাছে দুটি জিনিস খুব পরিষ্কার ছিল—তা হল, ইংরেজ-শাসনে প্রাচীন গতানুগতিক চিন্তাদর্শনের অচলায়তনের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে এক নবযুগের ইঙ্গিত এবং ইংরেজ-শাসন বণিকসুলভ মনোবৃত্তি থেকেই এদেশের মানুষকে কোনো বিষয়ে যোগ্য হতে দিচ্ছে না—কেননা তাতে বণিক ইংরেজের শোষণব্যবস্থার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি তাঁদের স্ব-বিরোধ এনে তাঁদেরকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছে। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি।

বেঙ্গল স্পেকটেটরে তাই যেমন একদিকে ইংরেজ-কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজের কাছে আবেদননিবেদনের উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

বেঙ্গল স্পেকটেটরে ইয়ং-বেঙ্গলের মানবমুখিন বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। তাঁরা নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—কিন্তু সেই নীতির লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা নয়, ইউরোপের নবজাগরণ যুগের হিউম্যানিস্ট গড়ে তোলাই সেই নীতির লক্ষ্য। বেঙ্গল স্পেকটেটরে প্রকাশিত —ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের বস্তুতান্ত্রিক মনটির সঙ্গে সমসাময়িক কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার মারফত প্রগতিমূলক সংস্কারকে প্রচলিত করার চেষ্টা চলেছে এবং বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতির সাহায্যে হিন্দু-ধর্মের অনৈক্য প্রদর্শন করে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের মূলে আঘাত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে তাঁরা আরোহী রীতিকে সরাসরি অস্বীকার না করলেও অবরোহ রীতির উপর একটু বেশি জোর দিয়েছেন; স্থির প্রাচীন শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় তাঁরা মোটামুটি বিশ্বাসী এবং এইজন্যে প্রচলিত কুসংস্কারকে আঘাত করার জন্যে তাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রাদিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় প্রগতিমূলক সংস্কার চেয়েছেন পরিবর্তিত যুগের কথা ভেবে। মানুষকে গোড়া থেকেই মানুষ ভেবে। শাস্ত্রের চশমা পরে তাঁরা মানবিক গুণসমূহের প্রতিষ্ঠা চান নি।

১৮৪২ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী সভার তৃতীয় জন্মতিথি উপলক্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি হয়েছিল :

ক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বেদান্ত দর্শন

খ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের আবশ্যকতা

গ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—

কিন্তু ১৮৪২ খ্রীঃ ইয়ং-বেঙ্গলের জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowledge) অধিবেশনগুলির মধ্যে ধর্মনৈতিক আলোচনার কোনো স্থান ছিল না। অর্থাৎ আমি এই কথা বলতে চাইছি যে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চেয়ে ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের বণিকসভ্যতার চেতনাটি অনেক সুস্পষ্ট ও অনেক সামগ্রিক।

বেঙ্গল স্পেকটেটরে বণিকসভ্যতার জাতীয়তাবাদী চিন্তাদর্শের যে বীজ রোপন করা হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে সেই বীজ বিকশিত পল্লবিত হয়ে সবল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই দিক দিয়ে ইয়ং-বেঙ্গলের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

আইসল্যাণ্ডের জীবনগাথা

উপন্যাসের বিংশ-শতকী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ল্যাক্স্‌নেস্-এর অবদান লোকগাথ
উপকথার পরিবেশ। ল্যাক্স্‌নেস্-এর উপন্যাসে লোকগাথার কল্প
অতীত চিন্তা ও সংস্কারের প্রতীক হয়ে থেকেছে—লোকগাথা ইতিহাসে
মঞ্চপট রচনা করেছে। কোনো মানুষই একা ও অনন্য নয়—প্রত্যেক মানুষ
ইতিহাসের ধারার পরিণতি। তাই উপন্যাস যখন কোনো এক সম
সমাজের জীবনকে উপজীব্য করেছে, তখন সমাজের অতীতকে অপরিহার্য
ভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে—অতীতের সঙ্গে লড়াই করেই বর্তমান জ
নিয়েছে। "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ পীপ্‌ল" উপন্যাসে একালের আইসল্যাণ্ডের
মানবসত্তার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ নায়ক বিয়াতুর যখন ডাকিনী গুল্‌ভর এ
অশুভ শক্তিকে উপহাস করে, তখন আধুনিক মানুষের খোলা-মন খোলা-চো
জীবনদর্শনই ঘোষিত হয়, বিয়াতুরের প্রতীকরূপের সঙ্কেত মেলে।

আইসল্যাণ্ডের বীরগাথায় গ্রথিত অন্ধকার যুগের মূল্যায়নই ল্যাক্স্‌নেস্-এ
বর্তমান উপন্যাসের কেন্দ্রিত প্রসঙ্গ। দক্ষ ব্যঙ্গরসিকের স্বভাবজ প্রকাশরী
ল্যাক্স্‌নেস্-এর আয়ত্ত। তাই সামান্য অত্যুক্তির আশ্রয়েই থর্‌গো
থর্‌মোড্-এর জীবনধারার অসঙ্গতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকাশরীতি-চরি
চিত্রণে সেরভান্তেস্-এর "ডন্ কিয়োটে"-র সঙ্গে বর্তমান উপন্যাসের সাদৃ
অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু, সেরভান্তেস্-এর প্রতিবাদ শিভাল্‌রি
যুগের রোমান্স্-সাহিত্যের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে; আর, ল্যাক্স্‌নেস্-এ
প্রতিবাদ মধ্যযুগের আদিপর্বের সাগা-সাহিত্যের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। ত
সমালোচনার প্রকৃতিও স্বভাবতই ভিন্ন। রোমান্স্-সাহিত্যের অন্ত
মানবতাবোধ অপ্রশংস স্বীকৃতির দাবি রাখে; ডন্ কিয়োটে হাস্যকর হ
উঠলেও সহানুভূতি থেকে কখনও বঞ্চিত হন না। থর্‌গ্যের-এর জীব
পরিকল্পনা প্রায় অমানুষিক—তাই সহানুভূতিবোধের সুযোগ স্বল্প। প্রকৃতি
শোভা, নারীর প্রেম, ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদ, সুখভোগের লোভ—কোনো-কিছু
থর্‌গ্যের-কে স্পর্শ করতে পারে না। নরহত্যার রক্তাক্ত পথে যুদ্ধজ

The Happv Warriors—Halldor Laxness : Translated
Katherine John. Rupa & Co., Calcutta. (Rupa Paperbacks), Rs. 3

যশোলাভ থর্‌গ্যের-এর জীবনের একমাত্র ব্রত। যুদ্ধজয়ের যশ ডন্ কিয়োটে-রও কাম্য। কিন্তু মানবকল্যাণার্থেই ডন্ কিয়োটে-র যুদ্ধযাত্রা। কুইন্টানারের জন্ হাল্‌ডুডোর অত্যাচার থেকে অসহায় অ্যাণ্ড্রুকে রক্ষা করে তার পাওনা মাস-মাহিনা চুকিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে ডন্ কিয়োটে তৃপ্তিবোধ করেন, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে গর্ববোধ করেন, "অন্যায়ের প্রতিকর্তা" বলে নিজের পরিচয় দেন। থর্‌গ্যের-থর্‌মোডের যশোলিপ্সা একান্তভাবে স্বার্থনির্ভর।

ডন্ কিয়োটে ও থর্‌গ্যের—উভয়েরই ব্যর্থতার মূল কিন্তু একই সমস্যায়। উভয়েই পরিবেশমধ্যে মূর্ত অসঙ্গতি, উভয়েই একাকীত্বে অসহায়। ডন্ কিয়োটে-র মতো থর্‌গ্যেরও আপন প্রতিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সমাজের আলো-হাওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মৃত্যু অনিবার্য—এ-বোধে থর্‌গ্যের উপনীত হতে পারে নি। থর্‌গ্যের যখন যুদ্ধের উপলক্ষ খোঁজে, তখন থর্‌গিল্‌স্ তাকে উপদেশ দেয়: "ওরা যেখানে সীলমাছ ধরছে, তিমিমাছ কাটছে, লোহা গলাচ্ছে, কাঠকয়লা পোড়াচ্ছে, তুমি সেখানে যেতে পার।...ওরা যেখানে গীর্জে বানাবে বলে গাছের মোটা গুঁড়ি ফাটিয়ে চৌচির করছে, সেইখানে গিয়ে তুমি হাতে করাত তুলে নাও।" জীবনের ধারা যখন শান্ত হয়ে এসেছে, তখন একটা মানুষ অশান্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই অদ্ভুত যুদ্ধকামনা যে একান্তভাবেই অসামাজিক ও অমানুষিক, ল্যাক্স্‌নেস্ তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। থর্‌ডিসের শয্যায় সুখ ও শান্তির রাজ্য ছেড়ে থর্‌মোড্‌কে দু-দুবার যুদ্ধযাত্রায় বেরোতে হয়। সংসারের সুখ, সমাজের সুখ, যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই যুদ্ধকামনার মৌল বিরোধ এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অপত্যস্নেহ, মায়া, মমতা, করুণা—সকল কিছুকেই অস্বীকার করে থর্‌গ্যের-থর্‌মোড-এর অভিযান। জীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ধারার সঙ্গে থর্‌গ্যের-এর জীবনধারার বৈপরীত্য প্রকট করে তুলতে ল্যাক্স্‌নেস্ বারেবারে সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন।

থর্‌মোড্ কবি। তাই থর্‌গ্যের-এর আকর্ষণে ভুলেও সে তার মানবিক মূল্যবোধগুলিকে বিসর্জন দিতে পারে না। দুই আকর্ষণের মধ্যে থর্‌মোড্-এর জীবনব্যাপী টানাপোড়েন—একদিকে সুন্দরী প্রেয়সী বধূ থর্‌ডিস্, আর শিশুকন্যা চাঁদ ও তারা, অন্যদিকে থর্‌গ্যের আর কোলব্রাউ। কোলব্রাউ যেন এক কুটিল অমানবিক, জৈব শক্তি। থর্‌গ্যের-এর যুদ্ধকামনার সঙ্গে তার

যেন একটা অস্পষ্ট যোগ আছে। কোলব্রাউ-এর আকর্ষণ নারী-পুরুষের সুস্থ স্বাভাবিক প্রেমের নঞর্থক, সমাজবিরুদ্ধ শক্তিবিশেষ। তাই কোলব্রাউ-এর আত্মপরিচয়: "আমি সেই নারী, পাতালের গভীরে যার বাস।" কোলব্রাউ যেন আরেক গুন্‌ভর—অন্ধকার অতীতের যাবতীয় অশুভ শক্তির প্রতীক-স্বরূপ!

একা মানুষ অসহায়। আর, এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েই স্বার্থ-সন্ধানীদের বিজয়াভিযান। ফ্রল্ কোলবাক্‌কে থর্‌ডিস্ জিজ্ঞেস করে, "মার খেয়ে তুমি কাঁদ না কেন?" কোলবাক্ জবাব দেয়, "ছোট্ট মেয়ে আমি কাঁদি না, কেননা বীরপুরুষেরা আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। মাঠের মধ্যখানে ওরা আমার বাবাকে কেটে ফেলেছিল, আমার বুড়ো অথর্ব ঠাকুরদার পেটে বর্শার ফলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে আমার ঠাকুমা কোলামকিল্-এর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন—কুঠারের চক্‌চকে ফলাটা ওরা ওঁর মাথার উপর বসিয়ে দিয়েছিল। তাই আমি কাঁদি না। আমার বাচ্চা ভাইটাকে উলঙ্গ করে ওরা বর্শার ফলায় ফলায় লোফালুফি করেছিল। আমার মাকে, আমার বোনকে ওরা জাহাজে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট মেয়ে, সেই সব কথা তো ভুলতে পারি না—তাই আমি কাঁদি না।" বীরগাথায়, মহাকাব্যে দুঃখ-বেদনার যে কাহিনী অকথিত থাকে, তার সত্যতা সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হয়। সমসাময়িকদের চোখে যে ঘটনা গৌণ হয়ে থেকেছে, মানবতাবোধের স্পর্শে গৌরবান্বিত উত্তরকালের চোখে সেই ঘটনাই অর্থময় হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাক্‌স্‌নেস্ লক্ষ্য করেছেন যে, এই অনাচারকে প্রতিরোধ করার শক্তি মানুষের আয়ত্তে—সমাজচেতনার সংহতি এই প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার। তাই লণ্ডনের জনসাধারণের সামনে ভাইকিংদের পিছু হটতে হয়। ইনুইট্‌রা থর্‌মোডের পাপের শাস্তি দেয় একাকীত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত করে—"ওরা সেইদিন থেকে অপরাধীর মুখদর্শন করে না, তার উপস্থিতি স্বীকার করে না। ওদের চোখে, সেদিন থেকে সে একা—আর, যে মানুষ একা, সে তো মৃতই।" বীরপুরুষেরা যেন খুনীর জাত—আর এই ইনুইট্‌রা মানুষকে হত্যা করতে জানে না, "মানুষের রক্ত দেখে চোখের জল আটকাতে পারে না।" এই দুই জাতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য একই সূত্রপ্রসূত। বীরপুরুষেরা সমাজকে অস্বীকার করেছে, সামাজিক সম্পর্কগুলিকে

মিথ্যা ঘোষণা করেছে। ইনুইট্‌রা সমাজের মধ্যেই তাদের জীবনের, তাদের অস্তিত্বের যা-কিছু মূল্য খুঁজে পেয়েছে। মূল্যবোধের রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গেই বীরপুরুষদের কাল ফুরিয়েছে, ইনুইট্‌দের সমাজচিন্তার ভিত্তির উপরেই উত্তরকালের সমাজচিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

থর্‌গ্যের-থর্‌মোড্-এর অসামাজিক জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা আইস্‌ল্যাণ্ডের আদি বিশ্বলোকদর্শনের সঙ্গে যুক্ত। উত্তর ইউরোপীয় বিশ্বদর্শনের আদিপর্বের চিন্তায়, সারা পৃথিবী যেন এক দৈত্য—আকাশ তার মাথার খুলি, মাটি তার গায়ের মাংস, আকাশে ভাসমান মেঘরাজি তার মস্তিষ্ক, সমুদ্র তার শিরায় প্রবাহিত রক্ত। প্রকৃতির দুর্বোধ্য শক্তিসমূহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে দৈত্য কল্পনা করে আদিম মানুষ তার প্রশ্নের জবাব পেয়েছিল। সেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে সারা পৃথিবীকে পদানত করার অভিলাষ সহজেই মনে এসেছিল। সেই থেকেই বোধ হয় বীরপুরুষদের বিশ্বজয়ের অভিযান।

স্নরি স্টুর্লুসন্-এর দ্বিতীয় "এডা"-র রচনারীতি ল্যাক্‌স্‌নেস্ সযত্নে অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাগা-র মেজাজ বর্তমান উপন্যাসে পরিব্যাপ্ত। তথাপি "রিগস্‌থুলা"-র আর্ল-কার্ল-থ্রল্ শ্রেণীবিভাগ ও রাজতন্ত্র প্রশস্তিকে উপহাস করতে ল্যাক্‌স্‌নেস্ দ্বিধা বোধ করেন না। এথেল্‌রেড্, থর্‌কেল স্টুদারাল্ডসন্, ওলাফ্ হ্যারাল্ডসন্—প্রত্যেক নরপতির কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার কাহিনী ল্যাক্‌স্‌নেস্ তুলে ধরেছেন। যে কোনো সংকটের মুখেই এথেল্‌রেড অসুস্থ হয়ে পড়েন—রাজত্বের লোভে ওলাফ হ্যারাল্ডসন্ যে কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে থ্রল্-দের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিকে বারবার ল্যাক্‌স্‌নেস্-এর চোখ পড়েছে।

উত্তুরে শীতের হাওয়া এ-উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বয়ে যায়। তাই ভাষা সংযত, প্রকাশরীতি আতিশয্যহীন। জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস-বিপর্যয়, জয়-পরাজয়—কোথায়ও এতটুকু উচ্ছ্বাসের স্পর্শ নেই। এই শান্ত সংযম যেন উত্তুরে শীতের নিরুত্তাপ মনের সাক্ষী। সঙ্গে-সঙ্গেই জাত-ঔপন্যাসিকের "ডিট্যাচমেণ্ট"-এর প্রমাণ। এই "ডিট্যাচ্‌মেণ্টে"র গুণেই বিশ শতকের ঔপন্যাসিকমহলে ল্যাক্‌স্‌নেস্-এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। অন্তত এই একটি গুণে ল্যাক্‌স্‌নেস্ তলস্তয় মান্-এর সঙ্গে তুলনা দাবি করতে পারেন। অন্যদিকে, বর্তমান উপন্যাস দক্ষ ব্যঙ্গরসিকরূপে তাঁর নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

রাতের ঢেউ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ। সুরভি প্রকাশনী। তিন টাকা॥

গান্ধর্ব॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড। সাড়ে তিন টাকা॥

শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ বিশেষ কোনও অতিনাটকীয়তার আশ্রয় না নিয়েই কাহিনীর প্রতি পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন। কাহিনীর উপকরণও তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর চেনাজানা জগৎ থেকে এবং একমাত্র নায়িকাদের নামকরণ ব্যতীত আর কোনখানে এমন কোনও সূত্র তিনি রাখেন নি যাতে বলা যায় যে এই লেখক বাঙালী মধ্যবিত্তের চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি-পরায়ণ জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে অসাধারণত্বের খোঁজে ছুটেছেন। সত্যি বলতে কি, এটাই সত্যপ্রিয়বাবুর প্রধান গুণ যে তিনি সর্বদাই অন্তরঙ্গ, সামান্য ও ঘরোয়া হবার জন্যে উন্মুখ। তাঁর এই উন্মুখতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে তাঁর ভাষায় এবং আরো বিশেষভাবে হয়েছে তাঁর বিভিন্ন নারীচরিত্রের উন্মুখরতায়। অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে ভাষার আসল যেটা শক্তি তার বাসা বাঙালী মেয়েদের মুখে, পুরুষের মুখে সে-ভাষা অনেকটা কৃত্রিম। সত্যপ্রিয়বাবু ধরতে চেয়েছেন মেয়েদের সেই মুখের ভাষাকে।

হ্যাঁ, শ্রীঘোষের অনেকগুলি নারীচরিত্রই পাঠককে মুগ্ধ করবে তাদের বাক-পটুতায় অথবা বাক-সহজতায়। তাদের নাম যদিও বা কারও কৃত্তিকা বা মৃত্তিকা, কারও নভসি বা রোদসী, কারও ভূমিত্রী, তবু তারা কেউ দুর্বোধ্য নয়, মধ্যবিত্ত সংসারের আর দশটি মেয়ে যেমন হয়ে থাকে অবিকল সেই রকম; মহৎ আদর্শ, বৃহৎ চিন্তা, কূট সমস্যা নিয়ে তারা বিব্রত নয়, একটি ভালো বর, একটি মাথা গোঁজবার মতো ঘর, কজন স্নেহশীল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব, কিছু তুচ্ছ মান অভিমান—ব্যস্, এতেই তারা তৃপ্ত; এটুকুই তারা চায়।

জীবনের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছোট, এবং হয়তো এজন্যেই তারা সুখী—অন্তত জীবন সম্বন্ধে গুরুতর কোনও অভিযোগ তাদের নেই, তারা মনে করে না জীবনে এমন কিছু আছে যার পরিবর্তনের জন্যে চাই সচেতন প্রয়াস। যে মেয়ে চেয়েছিল নিজের চেষ্টায় জীবনের গতি পালটাতে সে হল 'নভসি', তাই শেষ পর্যন্ত তার পরিণাম অমন মর্মান্তিক। নারীচরিত্রের পক্ষে পৌরুষ একটা গুণ কি না জানিনে, তবে মোটামুটিভাবে সত্যপ্রিয়বাবুর নারীচরিত্রগুলি মনে করে যে সব ঘটনার গতিই সার্বিক মঙ্গলের দিকে, এবং সমস্যা বা বাধা নিতান্তই সাময়িক, কালের গতিতে আপনা হতেই সমস্ত অন্ধকার অপসৃত হবে, তাই শেষ পর্যন্ত ভূমিত্রী, বিভা, কৃত্তিকা, বারুণী সবাই ক্রমে ক্রমে সুখের মুখ দেখেছে।

অবশ্য একথা মনে করার কারণ নেই যে আমি কারও সুখে বাদ সাধতে চাইছি। চারটি প্রেমের ঘটনা নিয়ে লেখা দুটি উপন্যাসের চার জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাই কেন সুখী হল এজন্যে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দুটি উপন্যাসের উপসংহারে যে-ধরনের তথাকথিত প্রগতিবাদী মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি প্রণতি জানাতে আমি অক্ষম, কেননা এ-ধরনের মনোভঙ্গির যাথার্থ সম্বন্ধেই আমি সন্দিগ্ধ। ব্যক্তির কোনও বিশেষ ভূমিকা নেই, ইতিহাসের শুভঙ্কর গতিতে সবই ঠিক হয়ে যাবে, সবাই সুখী হবে এ-খুবই ভালো কথা। এরকম ভালোকথা যে-বই প্রমাণ করে সেটাও নিশ্চয়ই ভালো বই। সুতরাং অমন বই হয়তো সবারই পড়া উচিত।

কিন্তু আমার মনে হয় এইটুকুই যদি বক্তব্য ছিল তাহলে কেবল অবনী বারুণীর প্রেমোপাখ্যানটুকুই ব্যাখ্যা করে দিলেই তা প্রমাণ হত, বাকি তিনটি প্রেমোপাখ্যান অনাবশ্যক; কেননা কেবল প্রসঙ্গে নয়, প্রকাশেও এক একটি উপাখ্যান আর একটির সমান্তরালে এগিয়েছে, কখনও কখনও একজন নায়কের সঙ্গে অপর নায়কের সমস্যা পর্যন্ত প্রায় এক ধরনের। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির মধ্যে চারটি প্রেমোপাখ্যান থেকে যে উপরে কেবল অবনী-বারুণীর উল্লেখ করেছি তার কারণ এদের কাহিনীই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যেহেতু প্রেমের বিচিত্র পাকচক্রে আবর্তিত চার জোড়া নরনারীর মধ্যে এই দুজনই অপেক্ষাকৃত আত্মসচেতন এবং এদের ব্যক্তিস্বরূপে গভীরতার যে আভাস আছে তা কৌতূহলোদ্দীপক। অবনী ছাড়া বাকি তিনজন অর্থাৎ প্রভাত, প্রসাদ ও মাধব তা বলে অচেতন নয়, তারাও খুবই

সচেতন, তবে তাদের সচেতনতার একমাত্র উৎস হল এই বোধ যে তারা পুরুষ ; এরা তিনজনেই বেশ দাম্ভিক এবং আমার মনে হয়েছে তাদের দম্ভের একমাত্র ভিত্তি হল, তাদের পুরুষ-দেহ, অন্য কোনও গুণ নয়, ব্যক্তিত্বের অন্য কোনও মহিমা নয়।

নভসির চোখে প্রভাত একজন গুণী বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ নভসি চেয়েছিল অসাধ্যকে সম্ভব করতে। তদুপরি সে বড়লোক ; দুখানি উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র সে-ই সমস্যাকে কিছু ঘোরাল করে তুলেছে—হয়তো কাহিনীর মধ্যে যে জট সে পাকিয়েছিল তা খুলতে না পেরেই লেখক তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দুখানি উপন্যাসের অনেকগুলি নারীচরিত্রের মধ্যে বারুণীর পরে নভসিই কিছু আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়েছে, জৈব শ্রেষ্ঠতা-জনিত পুরুষালী দম্ভের সামনে সে মাথা নোয়ায় নি। এমনকি ভূমিত্রীও যে ধরনের কাঙালপনা দেখিয়েছে প্রভাতের জন্যে তা স্বামীর ঘর ছেড়ে-আসা মহিলার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক ঠেকে নাকি ? দুখানি উপন্যাসের চারজন প্রেমিকের মধ্যে অবনীই একমাত্র পুরুষ প্রেমের টানে যে বারবার বারুণীর কাছে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুখানি উপন্যাসই হয়েছে বিরহ-মিলনের দুখানি অতি মিষ্টি গল্প।

তাই দুখানি বইয়ের প্রীতিকর উপসংহারে উপনীত হয়ে একথা ভেবে আমি পীড়িত হয়েছি যে সত্যপ্রিয়বাবুর যেটা গুণ ও শক্তি সেটাই তাঁর দুর্বলতা। ঘরোয়া পরিবেশেই তিনি বিশিষ্ট এবং সহজীকরণই তাঁর অভীষ্ট। দৈনন্দিনকার নিয়মিত ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত ও পৌনঃপুনিকতায় মসৃণ তথা স্বচ্ছন্দ জীবনধারাকে তিনি খুবই নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ; এর মধ্যে এমন কিছু ঘটে না যাতে উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবন সম্বন্ধে কোনও অমূল্য অতল অভিজ্ঞতা লাভ করি, যাতে জীবনের কোনও গভীর তল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যাতে দেখা যায় এই ধারার তলায় পড়ে-থাকা কোনও একটা পাথর যার গায়ে কালস্রোত এঁকে দিয়েছে অসংখ্য জটিল ও কুটিল রেখার আলপনা। একথা সত্যি হলেও হতে পারে যে আমরা অধিকাংশ মানুষই বেঁচে থাকি অনায়াসে, সাবলীলভাবে, সংসারের দুঃখ-কষ্ট গায়ে সয়ে, জীবন সম্বন্ধে অচেতন হয়ে, আত্মবিস্মৃতির মধ্যে। কিন্তু শিল্প কি জীবনের দর্পণমাত্র। জীবনের প্রতিলিপিতেই কি শিল্পী আনন্দিত? প্রাত্যহিকতায় আত্মবিস্মৃতির যে খোলস আমাদের চারপাশে গড়ে ওঠে

সেটাকে ফাটিয়ে দেওয়াই কি শিল্পের গূঢ়তম তাৎপর্য নয়? জীবনে হতাশ হবার কিছু নেই, শেষ পর্যন্ত সুখ-সার্থকতাই সত্য, ইত্যাকার বক্তব্য খুবই মধুর ও প্রগতিশীল এবং হয়তো ঐতিহাসিক অর্থে যথার্থও বটে, কিন্তু শুধু ওটুকু বললেই কি আমরা বেঁচে থাকার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি? নাকি ওটুকুতেই শিল্পীর দায়িত্ব চোকে?

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কালপুরুষ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। গ্রন্থ বিতান। তিন টাকা ॥

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত একাশিজন বাঙালী কবির এই কাব্য-সংকলনটি হাতে নিয়ে আমার সেই কথাই মনে হল, যে-কথা বহুবার অনুভব করেছি—বাংলাদেশের মানস-ভূগোলে ঐ মহাকবি পাহাড় বা নদীর মতো এমন এক অস্তিত্ব যার উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়ে হাজার রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত যা থাকে সেটা হল সবিস্ময়ে চেয়ে থাকার মতো মুগ্ধতা।

কিন্তু অনির্বচনীয়কে ভাষায় বাঁধাই মানুষের চিরকালের সাধনা। বিশেষ করে কবিদের তো বটেই। ফলে একাশিজন কবির বহুকাল-ব্যাপী কাব্য-সাধনায় কোনো-না-কোনো সময়ে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রোপলব্ধির সূর্যমুখী এবং তাই দিয়ে ডালি সাজিয়ে বীরেনবাবু দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এই শতকের বাঙালী কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কতখানি ছিলেন।

এ সংকলনের প্রত্যেকটি কবিতা তাই এক অনিবার্য প্রেমে উদ্ভাসিত। এ সেই প্রেম, যার তাগিদে মানুষ মুগ্ধ চোখে সান্ধ্য আকাশে রঙের মেলা দেখে, পথ চলতে নিজের অজ্ঞাতে গানের কলি গুনগুন করে, কিংবা প্রিয়তমার হাতে ছোট্ট একটি ফুল দিতে পেরে ধন্য বোধ করে।

অবশ্যই তার মানে এ নয় যে, কবিতাগুলি সবই প্রথম শ্রেণীর। মোটেই তা নয়। অনেকই আছে যা ব্যর্থ কবিতা। কিন্তু তাতে আন্তরিকতার দিক থেকে কোনো খাদ নেই, যেমন থাকে না শত শত অসার্থক প্রেমের কবিতায় কোনো ইচ্ছার অসাধুতা। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে গভীরতম উপলব্ধি এবং তার সার্থকতম প্রকাশ চিরকালই প্রাংশুলভ্য থেকে যায়!

রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁরা এখন বয়সে প্রবীণ, তাঁদের

সকলের না হোক অনেকের কবিতাই স্মরণীয়। তেমনি সার্থক হয়েছে অনেক তরুণ কবির রচনা। এই শেষোক্ত কবিদের রচনা বর্তমান সংকলনে উপস্থিত করাই সংকলকের প্রধান কৃতিত্ব।

মণীন্দ্র রায়

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ছ টাকা॥

জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত সনেটের আলোকে মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত হবামাত্র এর প্রকৃত মূল্যবিচারে ও ক্রটিনির্ণয়ে বহু বাদ-বিতণ্ডার স্বষ্টি হয়েছিল। এই বাদ-বিতণ্ডা যে একেবারে শূন্যে হয়েছে এমন কথা বলিনে, কেননা ত্রয়োদশ শতকের সাহিত্যের স্বরূপধর্ম বিংশ শতকে যদি একই ভাবে চলে, তাহলে এর সজীবতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে বিতর্ক একবার উঠেছিল, তাকে পুনরাবৃত্ত করে সমালোচনার মানদণ্ড ও মর্যাদাকে হেয় করতে চাইনে। তবে গ্রন্থটি পাঠ করলে সাধারণ পাঠকের মনে যে দুটি সন্দেহের কাঁটা উঁচিয়ে ওঠে, সে দুটি হল, সনেট যদি রূপান্তরের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েও সংগীতের সংযত স্বরমাধুর্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নিটোল ভাব মূর্তি প্রকাশে সহায়তা করে—তাহলে তাকে সনেট বলব না কেন? গ্রীক ট্রাজেডিকেই যদি একমাত্র ট্রাজেডি স্বীকার করে নিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র, ইবসেন, গল্‌স্‌ওয়ার্দী—বার্নার্ড শ'র নাটকের ট্রাজেডিকে নস্যাৎ করে দিই তাহলে সাহিত্যের প্রাণধর্ম কোথায় থাকে? অথচ প্রত্যেক ট্রাজেডির মধ্যেই নায়কের চরিত্রের আভ্যন্তরিক ও বহির্দ্বন্দ্ব একই সঙ্গে সংগ্রথিত হয়ে জীবনবোধের গভীরতর ব্যাপ্তিকে মহিমান্বিত করে তোলে, নাটকের অন্তিমে নায়কের বিষাদান্তক পরিণতিতে করুণরসের উচ্ছ্বন জীবনোপলব্ধির সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়ে সাহিত্য-জনিত অহং-অথচ-অহংমুক্ত আনন্দকে দর্শক ও পাঠকের মনে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়, এবং সংবিদানন্দ স্বষ্টি করে। স্থতরাং ট্রাজেডির প্রাণস্বরূপ ধর্ম যদি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও করুণ রসের ব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নিয়ে বিচার করি, তাহলে বিভিন্ন যুগের ট্রাজেডিতে আপাত দৃশ্যমান বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করেও মূল লক্ষ্যে পৌছতে আমাদের কষ্ট হয় না। সনেট বিচারে আমরা এই পন্থাকে চরম পন্থা হিসাবে স্বীকার

করে নিয়ে ত্রয়োদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বৈচিত্র্যকে অঙ্গুলি নির্দেশ করব। সাহিত্য পরিবর্তনশীল, ফর্ম পরিবর্তিত হবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হলে প্রত্যেক যুগেই কিছু সার্থক সনেটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। এবং এমন মন্তব্য প্রকাশে নিবৃত্ত হব, "ইংরেজী সনেটের কুপ্রভাবে বাংলা সনেটের বিশুদ্ধি কলুষিত হয়েছে।" (৪১ পৃঃ)

দ্বিতীয় দিক হল রবীন্দ্রপ্রতিভার ও তাঁর পূর্বে বিহারীলারের কাব্য-প্রতিভায় মধুস্থদনের ছন্দ, বাক্যস্পন্দ, উপমা ও ভাবের প্রতিফলন দেখাবার অত্যুগ্র চেষ্টা। স্বীকার করি মধুস্থদন উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকেও সমালোচনার দিক থেকে অনেকটা উপেক্ষিত কবি, হয়তো মধুস্থদনের বৈদগ্ধ্য আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্য সমালোচকের বৈদগ্ধ্য ঠিক সমপর্যায়ের নয়, অনেক নিম্নস্তরের, তাই তাঁর কাব্য-সমালোচনা যথাযথ হয় নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর মহত্ত্ব ও প্রভাব দেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে সকলকে নস্যাৎ করে দিতে হবে—এ সত্য সাহিত্য সমালোচনায় টেঁকে না। বিহারীলাল যদি সত্যি মধুস্থদনের ছায়ায় কাব্য রচনা করতেন তাহলে আত্মভোলা কবি বিহারীলাল—এ সত্য কিভাবে স্থান পায়! মধুস্থদনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ এত দূরান্বয়ে, তাকে কিছুতেই কাছে টেনে আনা যায় না। কেননা, দুই কবি দুই প্রত্যন্ত সীমার কবি, অনুসরণে মৌলিকত্ব বিনষ্টির সম্ভাবনা অত্যধিক। আর এমনিভাবে মিল দেখাতে চেষ্টা করলে চর্যাপদের সঙ্গে এমনকি বিউল্‌ফের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সেই সাদৃশ্য প্রকৃত সাদৃশ্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক সমালোচক যখন চর্যাপদে চতুর্দশপদ দেখতে পেয়ে সনেটের অস্তিত্ব কল্পনায় উল্লসিত হয়ে হাস্যরসের স্বষ্টি করেন আমাদের মনে—বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের ওপর মধুস্থদনের প্রভাবও—সেই পরিমাণে না হলেও—অনেকটা স্মিতহাস্য ফুটিয়ে তোলে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ব্রজাঙ্গনার ছন্দপ্রভাব বিহারীলালে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু বিহারীলালের ঐ ছন্দ তো ভারতচন্দ্রে অতি স্থন্দরভাবে উদাহৃত হয়েছে। স্থতরাং একজনকে বড় করতে গিয়ে অযথা অন্যজনকে টেনে নিচে নামিয়ে দিলে সাহিত্যে অবিচার হয়।

কিন্তু বইটির অন্য গুণ অবশ্যস্বীকার্য। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে সনেটের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোথাও নেই, ইংরেজী সাহিত্যের সমস্ত ভাবনারাশি একই সঙ্গে একটি বইতে পাওয়া সহজ কথা নয়। দ্বিতীয়ত,

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পেত্রার্কার প্রেমজীবনের আলোচনা, যতদূর মনে পড়ে এ প্রথম, সেইদিক থেকেও বইটির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। তৃতীয়ত, তৃতী খণ্ডে অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ও মনোজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে যে একটি চমৎকার কথা বলেছেন তা রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য তথ্য। রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত গীতিকপ্রাণত বর্ষামুখর দিনে সর্বগ্রাসী পদ্মার মতোই তটসীমা চূর্ণ করে দিকদিগন্তে বিস্তারিত হতে চায়, কোনো বন্ধন মানে না, রূপের কোনো সীমা মানে না, কিন্তু সনেটে প্রভাবে তাঁর এই অসংযমিত উচ্ছ্বাস যে কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সনেট রবীন্দ্রনাথকে রূপমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে।

এই সমস্ত বিচারে সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপক ভট্টাচার্যে গ্রন্থটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। ১৮৬০ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুসূদনের হাতে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সনেটের জন্ম হয়। সেই প্রথম সনেট কবি মাতৃভাষায় যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাকে স্মরণ করেই অধুনা বাংলা সাহিত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করি।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থ লোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।

ছন্দ ও অলংকার॥ অতীন্দ্র মজুমদার। নয়া প্রকাশ। আড়াই টাকা॥

অতীন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে "কলেজের ছাত্রছাত্রী ও স্কুলকলেজের গণ্ডীর বাইরে যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠক ছন্দবিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে কৌতূহলী" তাঁদের সাধারণ ধারণা দেবার জন্যেই সহজ সরল ভাষায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু কৌতূহলী পাঠকের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর নেই এই বইয়ে।

বইয়ের প্রথম ভাগে অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অলংকার বোঝাতে গিয়ে অলংকারের উৎপত্তির ইতিহাস, অলংকারশাস্ত্রের কথা, ধ্বনি ও রসের সামান্য পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন অলংকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ,

বিশ্লেষণ করেছেন। বলা বাহুল্য, অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাস, ধ্বনি ও রসের আলোচনায় সূক্ষ্ম-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও নূতনতর দিকের আবিষ্কার নেই। পড়তে পড়তে শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর অলংকার চন্দ্রিকার কথাই বেশি করে মনে পড়ে। মনে হয়, অলংকার চন্দ্রিকার ভাষান্তরিত সংস্করণ পড়ছি, তবে তাঁর তীক্ষ্ণতা এখানে অনুপস্থিত। অলংকারের উদাহরণে সবগুলিই সার্থক ও ত্রুটিবিহীন হয় নি। স্বভাবোক্তি অলংকারভুক্ত এই কারণে, এতে কবিমনের ও মর্জির বিশেষ রঙে বস্তু-পৃথিবী রাঙিয়ে ওঠে এবং লৌকিক বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজন-অতিরিক্ত আনন্দ সৃষ্টি করে ; স্বভাবের উক্তি বা নেচারের যথাযথ ফটোগ্রাফি কাব্য নয়, এই দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রত্যেক কাব্য সৃষ্টিই স্বভাবোক্তি। সুতরাং সাধারণ অলংকারে বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে অর্থবৈচিত্র্যজনিত বক্রতা এখানে নেই, তাই সাধারণ অলংকার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু এই অলংকারে যদি অন্য রকমের উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে আর স্বভাবোক্তি অলংকার বলা চলে না। অতীন্দ্র মজুমদারের স্বরচিত কবিতায় সমাসোক্তিজনিত, বৃক্ষশাখা রিক্তভার ফলে তার নিরাসক্ত মন, শঙ্কিত শোভা, অবসন্ন বাতাসের আলিঙ্গনে উদাহরণগুলি যথাযথ হয় নি বলেই মনে হয়। যদিও শ্যামাপদবাবুর অলংকার চন্দ্রিকায় তাঁর স্বরচিত কবিতায় স্বভাবোক্তির উদাহরণে রক্তচক্ষু উপমাটি পাওয়া যায়।

অতীন্দ্রবাবুর বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এ অধ্যায়ে ছন্দের লক্ষণ ও উপাদান, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, গদ্য ছন্দ, ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিবর্তন, বাংলা ছন্দের বিশেষত্ব, বাংলা সনেট প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ; আলোচনা ঠিক নয়, উদাহরণ দিয়েছেন। মূলত ছন্দের আলোচনায় অতীন্দ্রবাবুর পারদর্শিতা ঠিক বোঝা গেল না। তিনি উপরি উপরি আলোচনা করেছেন, ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ছন্দের মূল সূত্রে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্মতায় অনুপ্রবেশ আছে। সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের বোঝাতে গেলে, কিছু বিশ্লেষণ দরকার, ছন্দের আলোচনায় সেই বিশ্লেষণ নেই, সামান্য কতকগুলি উদাহরণ আছে, ইতিহাসের সামান্য পরিচয় আছে।

ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিবর্তন আলোচনা করেছেন, অথচ অক্ষরমাত্রাগণের আলোচনা ব্যতিরেকে যে ভারতীয় ছন্দ অবিশ্লেষ্য তার ইঙ্গিত নেই। সংস্কৃত ছন্দে পংক্তির দীর্ঘতা ঠিক সমান কেন, প্রথম দুপংক্তি ও শেষ পংক্তি দ্বিতীয়

ও তৃতীয় পংক্তির কেন বেশি ঘনপিনদ্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির মধ্যেই পূর্ণ যতিচিহ্ন পড়ে কেন, এগুলি সাধারণ পাঠক জানতে চায়। শ্লোক ত্রিষ্টুভ জগতী ছন্দের মধ্যেই বৈদিক ছন্দ থেকে সংস্কৃত ছন্দে অবতরণকালে সুসংহত কাঠিন্য আসে, কখন আসে, কিভাবে আসে, তাও আলোচ্য। সংস্কৃতে যতির (ceasura) বিশেষ স্থান রয়েছে, এই ব্যতিক্রমগুলি কেন আসে এগুলিও বাংলায় আলোচনা করা উচিত ছিল। বাংলা ভাষার ঢিলে-ঢালা গোছের অলস প্রাণে সংস্কৃত ছন্দের সুকঠিন দৃঢ়তা ও সংযম একেবারেই অচল, কিন্তু জানতে গেলে ভালভাবে ধারণা করতে হবে, নতুবা পদে পদে ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। সংস্কৃত ছন্দের প্রাচীন ঐতিহ্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের আলোচনার আবশ্যকতা স্বীকার্য বলে মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা সমুদ্র উত্তরণের জন্যেই।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মতই অতীন্দ্রবাবু তাঁর বইয়ে সন্নিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আমার মতে মধুসূদন যে পয়ারের চোদ্দ অক্ষর নিয়েছিলেন বলেই ছেদের বৈচিত্র্যে অন্ত্যানুপ্রাসহীনতায় ইংরেজী ব্ল্যাংক ভার্সের প্রবহমাণতায় পয়ারের প্রাচীন আট-ছয় যতিভাগকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন একথা মনে হয় না। তাহলে তাঁর ছন্দে ও ভাবে বিদ্রোহের কোন মানেই থাকে না; যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়; কৃত্তিবাস কাশীরাম ভারতচন্দ্র পড়তে পড়তে অভ্যস্ত হয়েছিলেন বলেই অভ্যাসানুসারে আট ছয় ভাগ শতকরা প্রায় সত্তরটির মধ্যেই রয়েছে, এমন অনেক চরণও আছে যাকে কোনো রকমেই এই ছকে ফেলা যায় না, অকালে কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি, আট ছয়ের যতি ভাগের জন্যে পড়তে হয় অকালে কহ হে দেবি! অমৃত ভাষিণি। গিলক্রাইষ্ট যে যতিছেদের ভাগ প্রবর্তন করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যা গ্রহণ করেন, মধুসূদনে তা নেই। মধুসূদনের ষট্‌ত্রিংশ পত্রে যতির উল্লেখ, সংস্কৃতের যতি ও ছেদের একাত্মতাই প্রকাশিত। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। বইটির এমন অসম্পূর্ণতা থাকলেও অতীন্দ্রবাবুর স্বচ্ছ কবিভাষা পঠন স্বাদিষ্টতা এনে দিয়েছে।

বাণিক রায়

পায়ে পায়ে এতদূর ॥ জ্যোতিভূষণ চাকী। চিন্‌কো। দু টাকা ॥

সম্প্রতিকালে কিশোরদের জন্যে এত সরস ও সুলিখিত বই প্রকাশিত হচ্ছে যে নিজেদের ছেলেবেলার কথা ভেবে অনেকেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। অবশ্য আমাদেরও ছেলেবেলায় ছিল উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের মতো লেখকদের রচনাবলী। কিন্তু বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা ছোটদের জন্যে সরস রচনা এক রকম বিরল ঘটনা ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বহু ব্যবহৃত এবং চোখের সামনের অতিপরিচিত অনেক জিনিসকে উপলক্ষ করে আলোচ্য গ্রন্থকার পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনাই করে গেছেন যা বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। বেলুনের উদ্ভাবনের ইতিহাস থেকে টাঁকশাল, ডাকঘর, ফাউণ্টেন পেন, জুতো, কাপড়, চশমা-ছাতার গল্প ঝরঝরে লেখনীর স্পর্শে ছোটদের মনের মতো হয়েছে। আর প্রতিটি উদ্ভাবন আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে এক একটা লাগসই কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে মৌতাত আরো জমে। চশমা আবিষ্কারের উপলক্ষে সেই মজাদার গল্পটার একটু বর্ণনা করি—যা হচ্ছে, বিনা কারণে চশমা নেওয়ার শখের জন্যে অন্ধ সাজার ফলে শরৎচন্দ্রের মেজো ভাই প্রভাসের মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী।

"কম্পাউণ্ডের কাছে একটা কালো রঙের গরু চরছিল বারান্দায় এনে গরুটাকে দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি চরছে বল্?'…প্রভাস আমার চেয়েও সতর্ক মানুষ; গরুটাকে দেখে বললে 'ঘোড়া'। যাঁহাতক বলা ঘোড়া, এক বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়ের শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহগর্জন, 'বল্ কি ওটা'? ইঞ্চি কয়েক নীচু হয়ে আর্তকণ্ঠে প্রভাস বলে উঠলো, 'গরু, গরু, গরু।' চক্ষু-পরীক্ষার ঘরে গিয়ে, নিমাইবাবু পুনরায় প্রভাসের চক্ষু-পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। চড়ের কল্যাণে এবার প্রভাস দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিল।" প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে মানুষ কতটা এগিয়েছে তারই চমকপ্রদ ক্রমপরিণতির কাহিনী শিশু ও কিশোরদের ভালো লাগবে। গ্রন্থকারের ভাষাতেই বলি—"গল্পের টানে তথ্য পথ্য হয়ে উঠেছে।"

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বিষুব রেখা ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা মেলা। দু টাকা।

চুয়াল্লিশটি নাতিদীর্ঘ কবিতার সংকলন 'বিষুবরেখা' শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৬। গত দশকের (১৯৫১—৬০) আনন্দ-বেদনা, 'দুঃখ, আশা ও ব্যর্থতা, বিক্ষোভ, ঈশ্বরমুখিনতা ও নিরীশ্বর জীবনবিমুখতা এবং কখনও জীবনধারণের বিস্ময়-অনুভবের চকিত দীপ্তি—প্রায় সমস্তই অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা রচনার বিষয়বস্তু। কবিতাগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত সুষ্ঠ এবং জটিলতাহীন। তথাপি সময়ের জটিলতা একেবারে যে স্পর্শ করে না, তা নয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সমকালীন কবির কথা মনে পড়ে। তাঁর কবিতা প্রায় অনেকগুলিই বেশ স্মার্ট। সেই গুণটির জন্য তিনি বহু কবির ব্যবহৃত আঙ্গিক ও বাচনভঙ্গীকে আপন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সত্ত্বেও অমিতাভবাবু অমিতাভবাবুই থেকে যান। তবে কবির কবিতা রচনার বৎসরগুলির সংখ্যাল্পতার জন্য আমরা আগ্রহী থাকি, তিনি হয়তো অনতিকাল পরে সম্পূর্ণই নিজের মতো কবিতা লিখবেন।

তাঁর কবিতাগুলি থেকে কিছু সম্পন্ন পঙক্তি তুলে দিলেই তাঁর প্রতি অন্য পাঠকেরাও যথার্থ বিচার করবার অবকাশ পাবেন।

১। আবহমান মৃত্যুর ঢেউয়ে দুলছে বন্ধুরা। নিপুণ হন্তার মার শিকড়
পর্যন্ত। পুড়ে যেতে যেতে আয়ুর প্রতিবাদ তবু এক উজ্জ্বল সঞ্চার;
ডালপালা ছড়িয়ে দেবার মতো। রোদ্দুরে কারুকার্য নিয়ে এক
একটা দিন জ্বলে ওঠে তাদের মুখে। নিরুপম কলকাতা।
(পোড়ামাটির জন্ম)

২। ডাকের সাজ পরে যখন বিকেল এলো
তখন আরো একটু দেরী আছে।
ততোক্ষণে চোরাবালির উপর দিয়ে
অনেক ঘুরঘুরান্তি করে হাওয়া পৌছালো (ছায়া রোদ্দুরে)

৩। দোতলার বারান্দায় স্থিতচক্ষু, রোজ কারা থাকে।
কারা আনে স্মৃতি, দৃশ্য, ভিড়ের বিশাল
জটিল আলোর রেখা,
কিংবা কোন নীরবতা স্থির খুলে রাখে…
(মায়াবী আগুন)

কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে উৎসর্গ করেছেন অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিকে। সেই কবিতাগুলির বাচনভঙ্গী ও গঠনশৈলীর সঙ্গে উৎসর্গ যাঁদের করা হয়েছে, তাঁদের কবিতাগুলির কিছু কিছু মিল পাওয়া যায়।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার মধ্যেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় সঞ্চরণ করেছেন, নতুন কিছু ভাবা বা ভাবাবার চেষ্টাও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। প্রচুর বিদেশী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল, যা পঞ্চাশ দশকের কবিরা স্বেচ্ছায় সহজ হবার জন্য বর্জন করেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য, অমিতাভবাবু যদি আপনার শক্তির উপরে বেশি বিশ্বাস রাখেন (তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও এই কাব্যগ্রন্থটিতেই পাওয়া যাবে) তাহলে চিত্রকল্প, দৃশ্যচিত্র এবং চিত্রসংযোজনার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই নতুন কিছু করতে পারেন।

এই প্রতিশ্রুতিময় তরুণ কবির বিভিন্ন পথে সঞ্চরণ সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আরও অনবদ্য রচনার প্রতীক্ষায় রইলাম। কেননা তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে নিহিতভাবে রয়েছে যে আশ্চর্য কবিহৃদয়, তার স্পর্শও পাওয়া গেল। কবির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকেই আগ্রহী হয়ে, কিছু মন্তব্য করা সমীচিন মনে করেছি।

তরুণ সান্যাল

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

পথের বাঁকে ॥ নির্মলনলিনী ঘোষ। গ্রন্থ-বিহার। দু টাকা ॥

লেখিকার ভূমিকাতেই জানা যায়, উপন্যাসের গল্পাংশে একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যে, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের যাবতীয় দুঃখ-শোকের মধ্যেও নীরব কিন্তু দৃঢ়। খুব সরল সাদা-মাটা ভাষায় লেখিকা তাঁর প্রতিপাদ্যটি বোঝাতে পেরেছেন মনে হয়।

দীপারতি ॥ দুলাল চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সমিধ্। দু টাকা ॥

'লেখকের কথা' পাঠ করে জানা গেল উপন্যাসটি বহু বন্ধুর উপরোধ ও উৎসাহে লিখিত হয়েছে। সুতরাং, এই পরিশ্রমের ভিন্ন মূল্য আছে।

হলুদ নদী ॥ শ্রীশোভাময়। প্রাপ্তিস্থান : বুক হাউস। পঁচাত্তর নয়া পয়সা ॥

তিন খণ্ডে বিভক্ত আঠাশ পৃষ্ঠার কাব্য সঙ্কলন।

আমার মাটি ॥ মনোরঞ্জন বিশ্বাস। পুস্তকালয়। তিন টাকা ॥

আটটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটিকাটি বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। "দেশের ভূমি সংস্কার ও কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় শুধুমাত্র কৃষক জীবনকে কেন্দ্র করেই এই নাটক লেখার প্রয়াস। বলাই বাহুল্য, পরিপূর্ণ ভূমি-সংস্কার সংগঠিত না হলে যে গোটা ভারতবর্ষের মুক্তি নেই"—এই হল নাটকের বক্তব্য। গণনাট্য সংঘের একাধিক শাখা ইতোমধ্যে নাটিকাটি অভিনয় করেছেন।

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদটি চমৎকার। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর। সামগ্রিক রুচিতে, সম্পাদক ও সম্পাদক সমিতি 'একতা'র ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়!

স্বল্পায়তন আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের পত্রিকাটিতে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা পরিলক্ষিত না হলেও, সর্বত্র নিষ্ঠার স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিজ্ঞান ও প্রি-মেডিক্যাল ছাত্রদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে, পত্রিকাটিতে যদি বর্তমান সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও মেডিক্যাল ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যেত তবে আরও ভালো লাগত।

রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ প্রমাদ

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জার্মানীতে কালিদাস' প্রবন্ধটির লেখকের নাম হবে ভাল্টের রুবেন।

৫৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্রে 'বিলেফেণ্ডে' স্থলে 'বিলেফেল্ডে' হবে।

৫৮০ পৃষ্ঠার পঞ্চম ছত্রে 'খুবই অন্তর্দ্বন্দ্ব'-এর শুদ্ধপাঠ হবে: খুবই সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্ব।

'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে প্রকাশিত রচনাটির ৬২৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্রে 'বাজনা সহ যে প্রতিমা বিসর্জন-এর 'যে' স্থলে 'সে'; ৬৩৬ পৃষ্ঠার দ্বাবিংশ ছত্রে 'হতাশ বিলাস' স্থলে 'হতাশা বিলাস'; ৬৪৩ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে 'মার্জিতে' স্থলে 'মর্জিতে'; ৬৪৫ পৃষ্ঠার পঞ্চবিংশ ছত্রে 'মার্জিত' স্থলে 'মর্জিতে'; ৬৪৬ পৃষ্ঠার সপ্তদশ ছত্রে 'মূল্যবৃদ্ধি' স্থলে 'মূল্যবোধ'; ৬৪৭ পৃষ্ঠার চতুর্থ ছত্রে 'আনন্দ' স্থলে 'আসঙ্গ' পড়তে হবে।

পাঠকগোষ্ঠী

সমালোচনা প্রসঙ্গে

পরিচয় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরিচয় ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা' শীর্ষক পত্রটি পড়লাম। অশোকবাবু সাহিত্য রসিক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর লেখায় অবিচারের দুর্মর মত্ততা নেই। বরঞ্চ সুবিচারের জন্যই এক সুদৃঢ় প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশেষত তাঁর লেখায় এমন কয়েকটি অংশ রয়েছে যা নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা দেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনের অবস্থা এবং মূল্যবোধের ক্ষয় সম্বন্ধে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সঙ্গে তুলনা-মূলকভাবে যে মন্তব্যপূর্ণ ইঙ্গিত তিনি করেছেন, তা হয়তো আমাদের এই আলোচনায় উভয় পক্ষেরই ভূমিকা হিসেবে সমান কার্যকরী। আমার তৎপরবর্তী বক্তব্যগুলি দফাওয়ারি ভাবে সাজালাম।

প্রথম॥ কোনও literary movement (movement কথাটি কিন্তু অশোকবাবুরই) নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে উক্ত movement-এর সাহিত্যিক পশ্চাৎপট আলোচনা করা বিধিসম্মত। এই বিধি পালন ব্যতিরেকে ইচ্ছামতো যে কোনও আন্দোলনকেই অপ্রাসঙ্গিক ও কিম্ভূত-কিমাকার বলে প্রমাণ করা চলে। এই ভ্রান্তির ফলেই একদা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পদক্ষেপের কালে তাকেও দুর্বোধ্য ধাঁধার অভিধায় অভিহিত হতে হয়েছে। পুরনো শনিবারের চিঠির সংবাদ সাহিত্যের সংগ্রহ-সমাবেশে এবম্বিধ ভ্রান্তি-বিলাস সুলভ করতালি লাভ করেছিল। আজ কিন্তু দুঃস্মৃতির ঘোরেও তাদের কথা কেউ মনে করে না। আধুনিক গল্পের আন্দোলন আধুনিক কবিতার মতো কার্যকারণ পরম্পরায় ইতিহাসের নিয়মের স্বচ্ছন্দ পরিণাম কি না আলোচনা যদি সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তবেই এ আলোচনায় কিছু সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে—নতুবা নেই। আমি যা দেখছি তা হল এই: তিরিশের আধুনিক কবিরা তাঁদের দীর্ঘ শিল্পচর্চায় আধুনিক অনুভূতির যে ভাষা গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে এতাবতের বাংলা গল্পের ব্যবধান ছিল প্রায় কালগত। বিষ্ণু দের দীর্ঘ কবিতার মৌখিক চাল এবং তারাশঙ্করের বড় গল্পের চলতি রীতি যে একই কালের বাংলা কথ্য ভঙ্গি তা বোঝাবার জন্য

আমাদের সিনেমাগৃহের অপরাজিত ও মায়ামৃগের যুগপৎ বিজয়াভিযানের দিকে তাকাতে হয়েছে। এই বিসদৃশ ব্যবধান সাম্প্রতিকতম গল্প লেখকের হাতে ক্ষীয়মান। ভাষার প্রতীকী গতি প্রভৃতি যে সব বিষয়ে সমালোচক অযথা আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন তার মূলে অনুভূতিময় মানুষকে গদ্যে ব্যক্ত করার প্রয়াস। যদি প্রবন্ধকার কেন তরুণেরা এই অনুভূতিময় মানুষের সন্ধানী হল তার কারণ খুঁজতেন তা হলে দেখতে পেতেন যে গত কয়েক বছরের বাংলা গল্পে দিদি-বৌদি প্রাধান্য অথবা দূর শতাব্দীর নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ, অথবা আঞ্চলিক বিস্ময় উদ্ঘাটন যখন প্রফুল্ল রায়, বিমল মিত্র এবং অবধূতের ত্রিচূড়ায় গিয়ে পরিশেষে উপনীত হয়েছে—তখন তরুণেরা সেই বাস্তবের সৌখিন ফরমায়েশী কাগজে মোড়া রঙিন বাক্সকে পরিহার করে ভিন্ন পথযাত্রী হতে চেয়েছেন। যে সামাজিক অবস্থার কথা অশোকবাবু বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে উক্ত রঙিন বাক্সের সম্পর্ক ছিল মন ভোলানোর সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের সাম্প্রতিক মানুষের যন্ত্রণাকে বিষয় করতে গিয়ে নতুন ফর্মকে খুঁজছেন নতুন লেখকেরা। এদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সেই বিগত কয়েক বছরের সূক্ষ্ম আলোচনা অনিবার্য নয় কি।

দ্বিতীয় ॥ সত্যবাবু এবং দীপেনবাবুর গল্প দুটির বিষয় সংক্ষেপ যেভাবে করা হয়েছে তাও সমর্থনযোগ্য নয়। এভাবে তো রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টার গল্পেরও সামারি করে দেওয়া যায় এই বলে যে গল্প কিছুই নেই, একটা মেয়ে ছিল আর একটা পোষ্টমাষ্টার ছিল, শেষে পোষ্টমাষ্টারটা বদলী হয়ে গেল। কিংবা এই পন্থায় মহাভারতকে বলা চলে থোরা জমিন্ আউর একঠো জেনানা লেকে কাজিয়া। অথচ সত্যবাবুর গল্পের নায়ক অচিন্ত্যের গ্লানির কথা এবং দীপেনবাবুর নায়িকার যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করতেই হয়েছে। দীপেন্দ্রের গল্পটির বিষয় সংক্ষেপ করার সময়ে ভাষাকে অকারণে আটপৌরে করেও ("কি-ভাবে পয়সা রোজগার করবেন") বিষয় মহিমা খর্বিত হয়নি। কাজেই এর পরে যখন আকারহীন অস্পষ্ট বিষয়গুলির কথা ওঠে তখন বিস্মিত হতে হয়। সত্যবাবুর নায়কের গ্লানি আর দীপেনবাবুর নায়িকার সংগ্রামী দৃঢ়তা—এরা অস্পষ্ট বিষয় কী কারণে? এই গ্লানি এবং দৃঢ়তার অধিকারী মানুষগুলির পরিচয় চিহ্ন তাদের গ্লানিতে এবং দৃঢ়তাতেই। এবং সেই তাৎপর্যেই এদের কি ইতিহাসের নির্দিষ্ট পটে ধারণ করা যাবে না? অশোকবাবু যেখানে মার্কসবাদ মানুষকে কী ভাবে দেখে তার ব্যাখ্যা করেছেন তার

যথার্থতাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না। কিন্তু সাহিত্যিক মানুষকে কেমন করে দেখবে—কোন্ পদ্ধতিতে—সে সম্বন্ধে কোন সরলীকৃত নির্দেশ দেওয়া চলে কি? মার্কসবাদের সে নির্দেশ নেই।

তৃতীয় ॥ যদি কোন "আন্দোলনের" বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য কিছু থাকে তা হলে সমালোচক তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন—এমনটাই প্রত্যাশিত। প্রবন্ধকার দীপেনবাবুর 'জটায়ু' গল্পের কথা বললেন না। অথচ বললেই ইতিহাসের অংশীদার মানুষের কথা যে এঁরা বলেন সে কথা বলতে হত। বললেন না 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র কথা। পেতে পারতেন এ যুগের যুবকের প্রেমের গল্প। দেখলেন না দেবেশ রায়ের 'দুপুর' নামক আশ্চর্য সুন্দর গল্পকে। দীপেনবাবুর 'পরিচয়ে'র গল্পটি তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান গল্প নয়। আসল কথা আমার মনে হয় সমালোচক ভুল করেছেন একটি প্রধান ব্যাপারে। 'আন্দোলন' বলে যেটাকে মনে হচ্ছে তার প্রতিনিধি 'পরিচয়ে'র ঐ চারটি গল্প নয়। এমন কি 'ছোটগল্প নতুন রীতি' পত্রিকার সব গল্পও নয়। গত কয়েক বছরের বাস্তব-ব্যভিচারের প্রতিক্রিয়া নানাভাবে বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যকে সক্রিয় করেছে। এর মধ্যে দীপেনবাবু যেমন আছেন, তেমনি আছে কমল মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা', জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তর্মনা', মতি নন্দীর 'তাপের শীর্ষে'। এরা একই ব্যাপার নয়। কিন্তু একই ব্যাপার সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই কোন কোন তরুণ লেখকের কতকগুলি মুদ্রাদোষকে দেখতে দেখতে তিনি হারিয়ে বসে আছেন এদের তৈরি করা অনুপম ব্যঞ্জনা। দেবেশ যখন 'দুপুর' গল্পে বলেন: ডাকে ফেরত দেওয়া মায়ার ছবির মত দুপুরটা ঈষৎ মলিন হয়ে যাচ্ছে, হাতে হাতে ব্যবহারে ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন; অথবা দীপেন্দ্রনাথ যখন 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে প্রসঙ্গের অনুসারে বলেন: ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মত গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি—অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায়রে সমুদ্র।—তখন এদের ব্যঞ্জনাময় আবেদনকে অশোকবাবু যে অগ্রাহ্য করতে পারেন না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অশোকবাবুকে অনুরোধ এই যে তরুণ লেখকদের শক্তিমত্তাকে সহৃদয় বিবেচনা প্রদানের পূর্বেই তাদের প্রবন্ধচারী অহেতুক শক্তিমত্ততায় তিনি যেন ক্ষুব্ধ না হন।—যদিও তা নিঃসন্দেহে বিরক্তিকর।

চতুর্থ ॥ 'পরিচয়ের গ্রাহক সংখ্যা সীমিত—প্রভাব ক্ষীণ'—এমন ধরনের

মন্তব্য করা হয়েছে। এককালে গ্রাহক সংখ্যা ছিল আরো সীমিত, প্রভাব ছিল চতুর্গুণ। আসলে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা বলতে আমরা বেশীর ভাগ সময়েই বুঝি গল্প অথবা কবিতাটিতে ধর্মঘটের কথা লেখা আছে কিনা এই বিচার—যদিও একথাও কেউ কেউ জানি যে ভারতবর্ষের মজুর আন্দোলন এখনও পর্যন্ত কেবল মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন। আমরা যদি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার একটা উচ্চ মান স্থাপন করতে পারতাম তাহলে প্রভাব ক্ষীণ হত না। আমাদের মার্কসবাদী সাহিত্য জিজ্ঞাসা 'পরিচয়ে'র পাতায় ইদানিংকালে মাঝে মাঝে কেবল এই বলে ঝলসে উঠেছে যে অমুক লেখাটি মার্কসবাদ সম্মত হয় নি। এই নেতি কিছু প্রসব করে না।

পঞ্চম ॥ অশোকবাবুর লেখার সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য অংশ হল যেখানে তিনি বর্তমান বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে Intellectual লেখার প্রায় অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ করেছেন। উক্ত অপ্রাসঙ্গিক অকস্মাৎ মন্তব্যের জন্য বড়ই মর্মবেদনা পেলাম। সমালোচক কি প্রমথ চৌধুরী ধূর্জটীপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে মহাশয়ের গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নন? তাঁর "প্রায়"-এর শক্তি কি এতই বেশী যে সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে উক্ত চার মহারথীকেই পার করে দেওয়া যাবে?

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটগল্পে নতুন রীতি

'পরিচয়'-এর পৌষ সংখ্যায় শ্রীঅশোক রুদ্র বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা তুলেছেন। বিষয়টা সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে অনেকের মতো আমারও আগ্রহ আছে। 'পরিচয়'-এর এ বছরের নববর্ষ সংখ্যায় 'সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্য: নতুন প্রবণতা' নামে এই বিষয় নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি শুধুমাত্র 'প্রবণতা' নয়, প্রায় 'আন্দোলনে'র পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। 'দেশ' ও 'পরিচয়'-এর মতো নামী কাগজে 'নতুন রীতি'র গল্প, সেই বিষয়ে পত্রপ্রবাহ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'ছোটগল্প' ও 'কথামালা'-ও এসবের কিছুটা বাহন। আর ইদানীং বেরোচ্ছে 'ছোট গল্প: নূতন নীতি।' বেরিয়েছে 'এই দশকের গল্প', 'চর্যাপদের হরিণী' (যা ইদানীংকালের বিশিষ্ট রূপের

পরিপ্রেক্ষিতে পড়া বাঞ্ছনীয় বলে স্বয়ং লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন)। আর সংখ্যার দিক দিয়ে বললে তরুণদের একটা অতি বৃহৎ অংশ, প্রায় সবাই—এবং অনতিতরুণদের কয়েকজন যথেষ্ট রীতি-উৎসাহী। রীতি-নূতনত্ব সন্ধানে কেউ কেউ ফুটনোট দিয়েও গল্প লিখছেন। অনতিতরুণ রীতি-উৎসাহীদের কয়েকজন বিশিষ্ট পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নানা কারণে প্রভাবশালী ব্যক্তি; অতএব তাঁদের উৎসাহদান, তথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিক নৈকট্য—এ সব কিছুই তরুণদের উৎসাহিত করেছে।

এ বিষয়ে একটা প্রধান জিনিসেরই অভাব ছিল—সেরিয়াস আলোচনা। সেটির সূত্রপাত করে অশোকবাবু সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

তিনি কয়েকটি গল্পকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সে-গল্পগুলি যে বিচ্ছিন্ন নয়, তা দেখিয়েছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রের রীতি-আন্দোলনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অশোকবাবু অনুরোধ করেছেন যাঁরা এ আলোচনায় তাঁর 'প্রতিপক্ষে' দাঁড়াবেন, তাঁদের ভাষা যেন 'সুবোধ্য' হয়। ভাষার ক্ষেত্রে অনুরোধ রাখবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু পক্ষ যে আমার কোন্ দিকে উদ্‌গত তা আ ম নিজেই জানি না। সুতরাং আমি বক্তব্যটা উপস্থিত করি। পক্ষ-নির্ধারণের দায় থাক অন্যের।

আমার কাছে বিষয়টা আছে দুটো প্রশ্নের মাধ্যমে:

ক। 'নতুন রীতি' বলতে ঠিক কী বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য কী? পুরাতন রীতির সঙ্গে এর পার্থক্য ঠিক কোথায়? বাস্তবকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা কতটা?

খ। এই রীতির প্রয়োজনটা এখন ঘটল কেন? কোন্ নতুন বিষয়কে প্রকাশ করবার প্রয়াসে এই রীতির সন্ধান?

দুই

'রীতি' শব্দটা ব্যবহার করে একটা গোলমাল করেছেন এঁরা। ফর্ম বা টেক্‌নিক্ বোঝাতে বাংলায় সাধারণত 'রীতি' কথাটার ব্যবহার করা হয় না।

যাই হোক, 'নতুন রীতি' বলতে লেখকরা কী বোঝেন তা তাঁরা 'ছোট

গল্প', 'ছোট গল্প : নূতন রীতি' ইত্যাদি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে পরস্পর-বিরুদ্ধতা আছে। অনেকে তাঁদের লেখাতেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর অন্যান্যদের মতের সঙ্গে মিল নেই। কেউ বলেছেন, 'বিশিষ্ট রূপটি এখনো আমার চোখে ধরা পড়ে নি।' রীতি-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীবিমল কর 'ছোট গল্প : নূতন রীতি'-র প্রথম প্রস্তাবে বলেছেন 'আমরা, যারা এই গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা সকলেই ছোটগল্পের ধারণা সম্পর্কে সর্বতোভাবে একমত নই।' এ কথা বলার পর অবশ্য তিনি বলছেন, 'তথাপি মোটামুটি আমাদের বলার বিষয়ে মিল আছে, মূল বক্তব্যে।' কিন্তু সত্যি মিল নেই। কারণ একাধিক তরুণ লেখকের লিখিত আলোচনায় দেখেছি যে তাঁরা কোনো কোনো ব্যাপারে বিমলবাবুর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমত, লেখকরা স্বতন্ত্র মতের অধিকারী ; দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো লেখক হয়তো এখনও নির্দিষ্ট স্বমতে পৌছন নি। এই রকম অনির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল বিষয়ের ওপর আলোচনা করা দুরূহ।

এঁদের আলোচক-অংশকে সরিয়ে রেখে লেখক-অংশকে সামনে আনলেও দুরূহতার অবসান ঘটে না। দীপেনবাবু যে গল্পগুচ্ছকে নতুন রীতির পরিপ্রেক্ষিতে পড়তে বলেছেন, তার অন্যতম 'ভাসান'-এর রীতি-স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা বোঝা মুস্কিল। 'ছোট গল্প : নূতন রীতি'-র দ্বিতীয় গল্প 'জটায়ু' সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। এর প্রতীক ব্যবহার যে কোনো চলতি-রীতির গল্পেই থাকতে পারত, অনেক সময় থাকেও। 'এই দশকের গল্প'-এর 'পিঞ্জর'-এর রীতি-নূতনত্ব কোথায় ? এ রকম উদাহরণ হয়তো আরো অনেক দেওয়া যায়।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও এদের অনেকগুলি গল্প পড়ে তার মধ্যে থেকে কয়েকটা সাধারণ সূত্র বার করবার চেষ্টা করা যাক। যে গল্পগুলিকে বিশেষভাবে রীতিস্বতন্ত্র করবার চেষ্টা লেখকরা করেছেন, প্রধানত সেইরকম কিছু গল্পই আমার বিশ্লেষণ-ভিত্তি। কোনো কোনো প্রবন্ধেও অবশ্য অনুরূপ কিছু সূত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সূত্রগুলি প্রধানত এই :

ক। চেতনা-প্রবাহের ভিত্তিতে গল্প বলা হচ্ছে ; এবং এর ফলে ঘটনা নয়, কাহিনীবৃত্ত নয়, অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবধারাই গল্প বলে ধরা হচ্ছে। এই

অ্যাবষ্ট্রাক্ট ভাবধারার ভিত্তিতেই বোধহয় ওঁদের 'গল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ' দেওয়ার প্রচেষ্টা। আর অনেকে অবচেতনের সঙ্গে সংযোগ করছেন এই রীতির মাধ্যমে। অবচেতনকে উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টাতেই বোধহয় এঁদের গল্পে এত স্বপ্নাতিশয্য।

খ। ডিটেল্‌স-এর প্রতি আকর্ষণ।

গ। প্রতীকের ব্যবহার।

তিন

ওদেশে এবং এদেশে আগেকার দিনে গল্প লেখা হত অত্যন্ত বাইরের দিক থেকে। পাত্রপাত্রীর মনের মধ্যে পাঠকরা বিশেষ ঢুকতে পেত না। এতে লেখক যেন অতিরিক্ত বড় হয়ে চরিত্র ও পাঠকের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকত। লেখক চরিত্রকে দেখাতও বটে, আবার আড়ালও করত। পাঠকের পক্ষে চরিত্রের মধ্যে মিশে অভেদ-অবস্থায় উপনীত হতে কিঞ্চিৎ বাধা থাকত। যাই হোক তবু ঘটনার রসটা পাওয়া যেত।

পরে কথা-সাহিত্যের ভারকেন্দ্র ঘটনা থেকে চরিত্রে ক্রম-অপসারিত হল। চরিত্রের সকল dimension-কে ধারণ করবার চেষ্টা চলল, মনের সকল তলের কার্যকলাপকে আলোকিত করবার প্রচেষ্টা হল। চরিত্রের বহির্ঘটনা মাত্র নয়, অন্তর্ঘটনাও বেশী বেশী পরিমাণে সামনে আসতে লাগল। কথাসাহিত্যের আঙ্গিক আলোচনায় পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা এর নাম দিলেন Inward turning।

আগে একজন লেখক একটা গল্প বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে (এবং গল্পকে দাঁড়াতে বাধ্য করে) একটা প্রকৃতি বর্ণনা সেরে নিতে পারতেন, বা পাঠকের সঙ্গে দুদণ্ড রসিকতা বা বিচারবিতর্ক করে নিতে পারতেন (যথা, বঙ্কিমচন্দ্র)। কিন্তু একালে তা সম্ভব নয়। একালে ঘটনাকে লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে সরিয়ে চরিত্রের দৃষ্টিকোণে বসানো হয়েছে। সুতরাং চরিত্রের দিক থেকে যা স্বাভাবিক, তাই মাত্র আসতে পারে।

চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বলার টেকনিক কিন্তু আমাদের বাংলা-সাহিত্যে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতির কথা বাদই দিচ্ছি। তারাশঙ্কর থেকে সমরেশ বসু পর্যন্ত, যাঁরা 'চলতি রীতি'-রই

প্রধানত অনুসারী, তাঁরাও চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই ইদানীংকালে গল্প বলছেন।

চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বলারই শেষ ধাপ চরিত্রের চেতনাপ্রবাহ-মাধ্যমে বলা। তখন চরিত্র ঘটনার মধ্যে বিশেষ থাকে না, মনের মধ্যে থাকে। চরিত্র তখন বলেও না, ভাবে। সচেতনভাবে ভাবেও না সে, স্ফুট-অস্ফুট নানা ছায়া-আলোর স্রোত তার চৈতন্যের ওপর দিয়ে যেভাবে বয়ে চলছে, তাকে ধরে রাখে সে। তাই মনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ভাবনাকেও সাহিত্যে আনা হয় ডিটেল্স-সহকারে। বাক্যগঠনের নিয়ম ভেঙে যায়। নানা ভাবানুষঙ্গের আলো-আঁধারী পথে প্রতীক জাগে। একটা ছায়া অন্য আর একটিকে স্মরণ করায়; একটা সুতো টানলে আর একটা সুতোয় টান পড়ে; মনের সেই জটিল সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করবার একটা পথ প্রতীক। পাঠককে এই স্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত করে লেখক নেপথ্যে সরে যায়। পাঠক চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। যে-কোনো ভাল গল্পেই এই অভিজ্ঞতা কিছুটা ঘটে। এই আঙ্গিক-মাধ্যমে তার অভিন্নতার পরিমাণটা আরো বেশী ঘটাবার প্রয়াস।

এ ঠিক গল্প বলা নয়, হেনরী জেম্স যাকে বলেছেন, 'The revelation of the story', এ তাই। কিন্তু এ পদ্ধতিতে চরিত্রের ভেতরে গিয়ে তার সঙ্গে যেমন একাত্ম হওয়া যায়, তেমনি অসুবিধাও আছে। এ পদ্ধতির ডিটেল্স্, বাক্যের গঠনহীনতা, প্রতীকতা প্রভৃতির আতিশয্য পাঠকচিত্তে একঘেয়েমির ও দুর্বোধ্যতার ভাব জাগাবে। জেমস্ জয়েস্ প্রভৃতির লেখা যতটা আলোচিত হয়েছে, ততটা পঠিত ও অনুসৃত হয় নি। একটা সতর্ক পরিমিতির মধ্যে এ রীতির সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই পরিমিতি অতিক্রম করলে অসুবিধা ঘটবে। জয়েস প্রভৃতির অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরবর্তীরা এ শিক্ষাটা নিয়েছেন। এবং ঐ রীতির আতিশয্যের দিকটা পাশ্চাত্ত্যে অনেকেই বর্জন করেছেন। বর্জন করলেও পুরনো কালের মতো বাইরে থেকে কাহিনীবৃত্ত রচনার পদ্ধতিতে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, আবার মানস-আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিলেও শুধুমাত্র মনে বন্দী হয়ে থাকতে চাইছেন না তাঁরা। মাঝামাঝি একটা পথ নিচ্ছেন তাঁরা। এই বোধহয় হালের অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য লেখকের মনোভাব। প্রিস্টলে তো তাঁর সর্বাধুনিক বইতে জয়েস ও তাঁর আঙ্গিককে রীতিমতো আক্রমণই করেছেন। আমাদের

দেশের যে লেখকরা অনুরূপ রীতি গ্রহণ করছেন, তাঁরা ওদের দেশের পরীক্ষার শিক্ষাটাকেও বোঝবার চেষ্টা করলে ভাল হয়। অন্ধভাবে অনুকরণ করবার আগে যাচাই করা উচিত। পাশ্চাত্ত্যের পরীক্ষা এ রীতির সীমাকে ভালভাবে দেখে নিয়েছে। সেটা দেখে শিখলে আমরা উপকৃত হব।

সামঞ্জস্যের প্রয়াস আর একটা কারণেও প্রয়োজন। উপযুক্ত আতিশয্যকে পরিমিতির শাসনে আনলেও চেতনাপ্রবাহ-রীতির সংকীর্ণতা পুরো ঘোচে না। একটা চেতনার স্রোতে যতটুকুর ছায়া পড়ে ততটুকুই এর সম্বল। সে-পুঁজি ব্যাপ্ত জীবনের তুলনায় নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র। রামায়ণকে যদি রামের চেতনার দর্পণে বিম্বিত করে দেখাবার চেষ্টা হয়, তবে রামের ভেতরটা আর একটু বেশী ছোঁয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য চরিত্র অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

এ রীতির এই সংকীর্ণতাকে বিমল কর প্রমুখ লেখকেরা অবশ্য অসুবিধা বলে মানতে চান না। বরং তাঁদের একটা ক্ষেত্রে সুবিধাই হচ্ছে। শ্রীকর 'গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাবজেকটিভ্ ভক্তির প্রয়োজনীয়তা' দেখা দিয়েছে বলে মনে করেন। 'এ-যাবৎ কাল একমাত্র কবিতা ছাড়া কোথাও লেখকের স্ব-চিন্তা ব্যক্তিত্ব ভাবনা আবেগ লেখায় খোলাখুলি প্রকাশ করা যেন নিষিদ্ধ ছিল।' বর্তমানে গল্পের দ্বার তার জন্য মুক্ত হয়েছে; 'গল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ' দেওয়া হচ্ছে। এবং 'এই চেষ্টা মূলত গল্পের হৃদয়কে শিল্পসম্মত সুদ্ধতা দেবার অভিলাষ।'

এই কথা থেকে কিরকম মনে হয় যে, যারা গল্পের সঙ্গে কবিতার বিয়ে দিতে পারে নি, তারা গল্পের হৃদয়কে শিল্পসম্মত সুদ্ধতা দেবার চেষ্টা করেন নি। এতটা মানা কঠিন।

একথা ঠিক যে যে গল্প নামের সাহিত্য-শাখাটি যথেষ্ট উদার। তার মধ্যে অনেকেই আশ্রয় নিতে পারে, কবিতাও। কিন্তু সেই ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে যদি কবিতাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে, কবিতার গোত্রে যদি গল্পকে গোত্রান্তরিত হতে হয়, তবে গল্পের পদবীটা বহাল রাখার আর কী দরকার! গোত্রান্তরিত হলে তো পদবী পরিবর্তনই উচিত। গল্প পরিচিত হোক কবিতার নামে গল্প নামের শাখাটি বিলুপ্ত হোক।

তরুণ গল্পলেখকদেরই একজন এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উক্তিটাই হুবহু তুলে দিচ্ছি, 'গল্প ও কবিতার পার্থক্য সম্প্রতি কারো কারো চিন্তায় নির্দিষ্ট নয়, এবং তাঁদের মতে আধুনিক গল্প কবিতার সহোদর;

রক্তে, এমনকি আত্মায় পর্যন্ত অভিন্ন। আমার বিশ্বাস, গল্প, কবিতা চিরকালই গল্প ও কবিতা ; গল্প বা কবিতা নয়। কোন কোন গল্প কবিতার মত একটি চিত্তের বৃত্তে ঘুরে ঘুরে পূর্ণতা পায়, কিন্তু তা কোন সময়ই কবিতা হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, কারণ নাড়ির যোগ যেখানে বিচ্ছিন্ন, সেখানে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা দর্পণের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তা না হলে কবিতা সত্ত্বেও বৃহত্তর প্রয়োজনে গল্প ও উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছিল।'

আর সাবজেক্‌টিভ ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিমলবাবু যে উক্তি করেছেন, তার ফল সুনিশ্চিত সীমাবদ্ধতা। চরিত্রসৃষ্টি ও বাস্তবতা উভয় ক্ষেত্রেই সংকোচ-বিধান এই ভঙ্গির প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফল। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে লেখক নিজের কথাই বলে যাচ্ছেন। চরিত্রের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ; একটা চরিত্র সব নামের অন্তরাল থেকে কথা বলছে। এবং যেহেতু আমাদের সব লেখকই মোটামুটিভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কারে-অভ্যাসে-অভিজ্ঞতায় মানুষ, তাদের পরস্পরের ভাবনায় পার্থক্য খুবই কম। ফলে, পাঠক শুধু একই লেখকের বিভিন্ন লেখার মধ্যে চরিত্রের পুনরুক্তি দেখছেন না, বিভিন্ন লেখকের রচনাতেও বিশেষ বিভিন্নতা পাচ্ছেন না। এতে যদি পাঠকের একঘেয়ে লাগে, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ছোট গল্পের এই সাবজেকটিভ ভঙ্গি বাস্তবকেও খণ্ডিত করে। মনোজীবনই একমাত্র সত্য, বহির্জগৎ বা কর্মজগৎ কিছুই নয়—এটা এক ধরনের একচক্ষুতা। মনের বাইরে জগৎটার একটা বস্তুগত সত্য আছে, তাকে না মানলে বা না দেখলেই তার অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না, ক্ষুণ্ণ হবে লেখকের পূর্ণদৃষ্টি। লেখকরা পূর্ণ জীবনের পথ চলা ছেড়ে দিচ্ছেন, সুধু মনের মধ্যে পথ চলছেন। আগের লেখকরা যখন শুধু বাইরে থেকে জীবনকে দেখতেন, তারা একটা দিক দেখতেন। এখন যাঁরা সুধু মনের মধ্যে জীবনকে দেখছেন, তাঁরা অন্য দিকটা দেখছেন। উভয়েই একদেশদর্শী, খণ্ডিত দৃষ্টির অধিকারী। বাস্তব দুটোর কোনোটাকেই বাদ দিয়ে নয়, বরং পরস্পর-অপেক্ষ। মনোজগৎ ও বহির্জগৎ পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল, এবং এই ইণ্টারঅ্যাকশন্‌-ই যথার্থ বাস্তব। বাস্তবের একটা গতি আছে ; উভয় জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই চলমানতা। বাস্তবকে ধরতে হলে এই গতির মধ্যেই তাকে ধরতে হবে। কিন্তু তরুণ লেখকেরা স্থিতিমুখী। বিমল কর বলছেন, 'বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের

নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি।' আন্তর-বৃত্ত-বদ্ধ মানুষ কিন্তু বাস্তবের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং ফলে যে-কোনো উন্মার্গগামিতা তার পক্ষে সম্ভব। উন্মাদ মানুষও কিন্তু আসলে আন্তর-বৃত্ত-বদ্ধ। তাদেরও একটা মনোজগৎ আছে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হচ্ছে না। তরুণ লেখকরা এতটা উন্মার্গগামী তা বলছি না, কিন্তু তাঁরা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করতে পারছেন না, এই আশঙ্কা করি। সেখানে যতই নিজেকে খাপ খাওয়াতে অপারগ হচ্ছেন, ততই মনের ভেতরে সেঁদিয়ে যাচ্ছেন।

কেউ এ কথা হয়তো বলতে পারেন যে লেখকরা গভীরতায় প্রবেশ করছেন। কিন্তু বহির্জগতের সব দিকে দেওয়াল তুলে মনের অন্ধকূপে সর্বদা মুখ গুঁজে বসে থাকলেই গভীরতায় পৌছনো যায় এমন নয়। জীবনস্রোতে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনে মনে জীবনের গভীরতায় পৌছনো যায় না। মনের দরকার আছে নিশ্চয়ই। জীবনে ডুব দিয়ে তারপর মনে মনে হিসেব করা যায় গভীরতার ; তার আগে সে-হিসেব করলে সেটা কাল্পনিকতা মাত্র।

তরুণ লেখকরা অনেকেই অতিরিক্ত হিসেবী। রীতির হিসেব না করে তাঁরা জীবনে নামবেন না। রীতির অনুমোদিত শর্তে জীবনকে দেখব ও দেখাব—এই এঁদের চেষ্টা। রীতির একটা আধার তাঁদের হাতে আছে ; তাতে জীবনের যতটুকু বা যা ওঠে তাই তুলবেন এঁরা। আসলে কিন্তু জীবনকে প্রকাশ করবার জন্যই রীতি, রীতির জন্য জীবন নয়।

এদিক থেকে তাঁদের অনেক লেখায় কৃত্রিমতা আছে ; রীতিটি অধিকাংশ গল্পেই অনিবার্য নয়, আরোপিত। সে-ক্ষেত্রে গল্পের যতটুকুও সম্ভাবনা ছিল তা রীতির চাপে ক্লিষ্ট, অস্পষ্ট।

এঁদের গল্পের দুর্বোধ্যতার মূলে এই কৃত্রিমতা একটা প্রধান কারণ।

প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই কৃত্রিমতা চিহ্ন যথেষ্ট প্রকট। প্রতীক এখানে জীবনের সঙ্গে মিশে নেই, বরং যেন অনেকটা আরোপিত। আর সেইজন্যই বহু সময় প্রতীক তার ব্যঞ্জনা ফোটাতে অপারগ হয়। প্রতীক এখানে অনেক সময় অপ্রয়োজনে আগত। বিষয়ের পরিস্ফুটনের দাবিতে তার অধিকার পাকা হচ্ছে না। এ যেন লেখকের খেয়াল-বশে বা রেওয়াজ-রক্ষায় ছাড়পত্র-পাওয়া অলগ্ন প্রবাসী মাত্র ; গল্পটার জলমাটির মধ্যে থেকে সে ফুটে উঠছে না। প্রতীক ব্যবহারও হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত। ফলে সাধারণ

পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হচ্ছে। এবং এর জন্যে সাধারণ পাঠক যথেষ্ট শিক্ষি হয় নি বলাটা আত্মত্রুটি ঢাকবার উদ্ধত প্রয়াস। পাঠকরা শিক্ষিত হয় নি, এ অপবাদ তরুণ লেখকরা একাধিক লেখায় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেন ভুলে যাচ্ছেন যে সাহিত্যের জন্ম যেমন ব্যক্তিক অনুভূতিতে, তেমনি ব্যক্তিকতাকে অতিক্রম করে সার্বজনীন সহিত-ত্ব পেলেই তা সাহিত্য। প্রতীক তো সেই উভয় পক্ষের সহিতত্ব ঘটাবার ইঙ্গিত-সেতু। সেটাকে একান্ত ব্যক্তিগত করলে পাঠকের বোঝা সম্ভব নয়। একান্ত ব্যক্তিকতার জন্যই অনেক যায়গায় স্বয়ং লেখককে তাঁর গল্পের মধ্যেই প্রতীকের ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। যথা, 'চর্য্যাপদের হরিণী'-র নায়কের উক্তি : 'অন্বেষার symbol আমার চর্যাপদের হরিণী।'

অথবা যদি তরুণদের দেওয়া অপবাদটা কাঁধে তুলেই নি যে আমরা গল্পপাঠে বা প্রতীক-বোধে যথেষ্ট শিক্ষিত হই নি, তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রেষ্ঠ প্রতীক-রচনার লক্ষণ এই যে তার প্রতীক ভেঙে গূঢ় মর্মে যে পাঠক প্রবেশ করতে না পারবে, সেও একটা ধরনে সাহিত্য-রস পাবে। নিশ্চয়ই সে প্রতীকজ্ঞ রসিকের তুলনায় কম পাবে। কিন্তু একেবারে শূ হাতে তাকে ফিরতে হবে না। শ্রেষ্ঠ প্রতীক-রচনার আবেদন উভয় স্তরের কাছেই থাকে—সে-আবেদনের গুণগত বা পরিমাণগত তারতম্য কিছুটা থাকা সত্বেও 'রক্তকরবী' দেখে বা 'দি ওল্ড্ ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' পড়ে 'অশিক্ষিত' দর্শক বা পাঠকও একটা স্তরে বুঝবে, ভাল লাগবে তার ; 'শিক্ষিত' পাঠক হয়তো আরো বেশী পাবে।

'চর্যাপদের হরিণী' বা 'ফুল ফোটার গল্প' সম্পর্কে এ কথা বলতে পারি না। অশোক রুদ্রের কাছে এগুলি দুর্বোধ্য ঠেকেছে। খুব স্বাভাবিক। এদের সমগ্র উপস্থাপনার মধ্যে এমন একটা বিমলবাবু-বর্ণিত সাবজেকটিভ ভঙ্গির আতিশয্য আছে যে অধিকাংশ পাঠককে গল্পের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকবার দরজা হাতড়াতে হবে। স্বীকার করছি এ গল্প দুটো অশোকবাবুর থেকে বোধহয় আমি বেশী বুঝেছি। তার কারণ দীপেনবাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালীন ব্যক্তিগত নৈকট্য। তাঁর ব্যক্তিক চিন্তা, তাঁর ঢাকায় যাওয়া, সেখানে নানা জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঢাকার নির্বাচনের অন্যতম দলীয় প্রতীক নৌকো, 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'সূর্যমুখী', আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতের ঘটনা-বিপর্যয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া—এই সব ঘটনা অংশ

আমার জ্ঞাত। সেই পটভূমিকায় গল্প দুটি বোঝা যায় হয়তো। কিন্তু একজন সাধারণ পাঠকের কাছে যে এটা গোলক ধাঁধা বলে মনে হবে তা খুব স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি। লিরিক-কবিকে বোঝবার জন্য আমরা তার ব্যক্তিমানসকে খুঁটিয়ে বুঝে নিই ; ব্যক্তিক পটভূমিকা জানা না থাকলে হয়তো অনেক সময় তাঁর একটি কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে বোঝা দুরূহ, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। ছোটগল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে বোঝার দিন কি শেষ হয়ে গেল ? লেখকের ব্যক্তি পটভূমিকা জানা না থাকলে কি পাঠককে পুরোপুরি বিমুখ করা হবে ? সেটা যে জানবে সে-পাঠক বেশী পাক, কিন্তু যে বিচ্ছিন্নভাবে পড়বে সেও অন্তত কিছু পাক। বিমলবাবু শেখভের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু শেখভের ব্যক্তিজীবনের বিন্দুবিসর্গ না জেনেও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর গল্পের একটা সুউচ্চ স্তর পর্যন্ত রসাস্বাদন সম্ভব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তারও পরে একটা কথা থেকে যায়। আমি না-হয় অশোকবাবুর থেকে পরিচিতি-দাক্ষিণ্যে একটু বেশী বুঝলাম, কিন্তু তার চরম ফলশ্রুতি কী ? বোঝার পর ভাল একটা গল্প পেয়েছি কি ? না।

ডিটেল্স্ সম্পর্কে একটা মোহও লেখকদের পেয়ে বসেছে। বাস্তব বা অবচেতন কোনোটারই খুঁটিনাটি সবটুকু বর্ণনীয় নয়। আর্ট মাত্রেরই কিছু সিলেক্‌শন থাকবে। তাৎপর্যহীন ডিটেলস্ ক্লান্তিকর বোঝা মাত্র। আলোক-ঠিকরে-তোলা হীরকখণ্ড বেছে নিতে হবে ; নিস্তেজ দীপ্তিহীন প্রস্তরখণ্ড নিষ্প্রাণ অন্ধকারকে চাপিয়ে রাখে পাঠকের মনে। দেবেশ রায়ের বহু গল্প এই ডিটেলস্-এর আতিশয্যে ভারাক্রান্ত।

চার

আর একটা প্রশ্ন—হঠাৎ এই রীতির প্রয়োজন ঘটল কেন ? গত বছর দু-তিনের মধ্যে এমন কী ঘটল বাংলা দেশে যার ফলে হঠাৎ প্রায় সব তরুণ লেখক এই রীতির অনুবর্তী হয়ে পড়ল ?

পাশ্চাত্ত্যে ইম্প্রেশনধর্মী বা চেতনাপ্রবাহী রীতি আরম্ভ হবার সময় এই কারণগুলি ছিল :

ক। আগের যুগের একপেশে কাহিনীবিন্যাস, যাতে কেবলমাত্র বহির্ঘটনার উপস্থিতি। এর একদেশদর্শিতা সম্পর্কে লেখকদের সচেতনতা

রাড়ছিল। এবং তার প্রতিক্রিয়ায় লেখকদের হাতে অন্তর্ঘটনা প্রধান হয়ে পড়ল।

খ। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করল। উইলিয়াম জেমসের চেতনা-প্রবাহ সম্পর্কে বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গ। ধনবাদী পদ্ধতিতে শিল্পায়নের প্রসার। এর ফলে পূর্বতন যুগের দৃঢ়সংবদ্ধ সমাজে disintegration ঘটল। মানুষ এক একটা ভাসমান দ্বীপখণ্ডের মতো অন্যের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার মনে দেখা দিল এককতা ও নিঃসঙ্গতার বোধ। তখনও সমাজবাদের মতো সমাজ-সংহতি-সাধক চিন্তা তেমন দানা বাঁধে নি। প্রতিকূল পরিপার্শ্বের কাছে ব্যক্তি একক, অসহায়, মনোরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী।

(এই জাতীয় রীতির লেখকদের অনেকেই ছিলেন অসুস্থ, ঘরকুনো, ইত্যাদি—এটাকেও কি একটা কারণ হিসেবে ধরা যায় না?)

প্রথম দুটি কারণ আমাদের দেশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তৃতীয় কারণটা আমাদের দেশে তত তীব্র নয়। ওদের দেশে এর তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও এ রীতি স্বল্প লেখকের অনুগৃহীত। আমাদের দেশে এর তীব্রতা ওদের দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম থাকা সত্ত্বেও তরুণদের প্রায় সবাই এই রীতিতে উৎসাহী। এইখানেই এই রীতি গ্রহণের কৃত্রিমতা। এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। ওদের দেশে যে যুগে এ রীতির উদ্ভাবন হয়েছিল, তখন সমাজ-সংহতি-সাধক চিন্তার প্রাধান্য সূচিত হয় নি। আমাদের দেশে যখন এ রীতির ঢেউ এসে লাগল, তখন সে-চিন্তা অতি-অগ্রসর, এবং কতকাংশে বাস্তবে রূপায়িত। অতএব এর কৃত্রিমতা আরোই বেশী। শুধুমাত্র কৃত্রিম নয়, পশ্চাৎবর্তিতার চিহ্নে চিহ্নিত। এ কথা ভাবা ভুল যে ওদের দেশে যে ঢেউ যেমনভাবে যত উচ্চে উঠেছে, আমাদের দেশেও ঠিক তাই উঠবে। ওদের দেশে অসহায় নিঃসঙ্গতার পর্ব যত তীব্র ও দীর্ঘ হয়েছে, আমাদের দেশে তা হয় নি, এবং বোধহয় হবেও না, কারণ সঙ্গবোধ ভাঙবার সূচনাতেই আশার নতুন আলোও দেখা যাচ্ছে।

বিমল কর সুন্দর ভাষায় পাশ্চাত্ত্যের তীব্র নিঃসঙ্গতাকে আমাদের মাটিতে বসিয়ে দিয়েছেন। এবং বলেছেন যে এইটেই এ দেশে রীতি-পরিবর্তনের মুখ্য কারণ। তাঁর বক্তব্যটা এই:

'মানুষের জীবন দু'শ বছরের মধ্যে অনেক বদলেছে। একজন বলেছেন, মানুষ যেন দীর্ঘকাল ছোট ছেলের মতন বাইরে বাইরে খেলা করে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখল সে প্রাজ্ঞ প্রবীণ হয়ে গেছে। বর্তমান যুগ মানুষের কুলায় প্রত্যাবর্তন। সে স্বগৃহে ফিরে এসে সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় তার প্রবীণতা ও প্রাজ্ঞতা দিয়ে নিজের কথা ভাবছে। আমাদের জীবনের অন্তর্মুখিতা তাই এখন এত প্রবল, বেদনাময়, স্বগত।···আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি—এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। অপরে কি বলবেন আমি জানি না, আমার মনে হয়েছে, কবিতা এবং উপন্যাসের মতন ছোট গল্পেরও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।'

দুশো বছর ধরে মানুষের যে পরিবর্তন ঘটেছে, যতটা তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সাহিত্যের পরিবর্তনও কিন্তু দুশো বছরই ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কথাসাহিত্যের ধারাকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে inward turning-এর মাত্রা ক্রমে বেড়েছে। চরিত্রসৃষ্টি তাতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বহির্বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তা নয় তারা। আর প্রশ্ন হল, হঠাৎ গত দু-তিন বছরে বাংলা দেশে এমন কী ঘটল যে সকল তরুণ লেখক একযোগে চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে গেল! তরুণদের অনেকে তো এই সেদিনও 'চলতি রীতি'-র পন্থী ছিলেন। স্বয়ং বিমল করের এই তো সেদিনের গল্পগ্রন্থ 'পিঙ্গলার প্রেম'—নতুন রীতির ছাপ সেখানে খুব আছে বলে তো মনে হয় না।

মার্কস্‌বাদী লেখকরা (মার্কস্‌বাদী লেখকদের প্রশ্ন তুলছি দুটো কারণে। এক, অশোকবাবু খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নটা তুলেছেন। দুই, তরুণদলের অধিকাংশ লেখকই—'পরিচয়ে' অশোকবাবু উল্লিখিত পাঁচটি নামের বাইরেও একটা বিরাট দল—নিজেদের মার্কস্‌বাদী বলে পরিচয় দেন) কি বহির্জীবনস্রোত থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন যে তাঁরা কুলায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় শুধু নিজের কথা ভাবছেন? তাঁরা কি আন্তর-বৃত্ত-বদ্ধ অনেক বেশী স্পর্শাতুর, উদাস, একাকী? অন্তর্মুখিতা তাঁদের প্রবল, বেদনাময়, স্বগত?

মার্কস্‌বাদীদের সম্পর্কে আমার যে সীমাবদ্ধ ধারণা, তা থেকে মনে হয় যে ব্যাপার তাদের ক্ষেত্রে এতদূর গড়াবার কথা নয়, যেহেতু বিশ্বাস করবার,

সঙ্গ পাবার এখনও তাঁদের কিছু অবশিষ্ট আছে। অনেক ভেঙেছে, সব ভাঙে নি, বরং অনেক কিছু তাঁদের এ সময়ে গড়েও উঠেছে।

আমার এ ধারণা যদি ভুলও হয়, তাহলেও প্রশ্ন থাকে—মার্কস্‌বাদীরা যদি নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন থেকে থাকেন, তবে তাঁদের সে-অবস্থায় দীর্ঘকাল না থেকে বহির্ঘটনাকে দেখা, বিশ্লেষণ করা ও অনুরূপ কাজ করার কথা, কারণ মার্কস্‌বাদীদের মূল নীতিই হল যে তাঁরা বহির্বাস্তবকে আয়ত্তাধীন করতে সদা-সচেষ্ট।

যাঁরা মার্কস্‌বাদে বা অন্য কোনো সদর্থক মতবাদে বিশ্বাসী নন, অথচ যাঁদের পুরাতন মূল্যবোধও ভেঙে গেছে, যাঁরা নিজেদের বেদনাময়, একাকী, আন্তর-বৃত্ত-বৃদ্ধ মনে করেন ; তাঁদের লেখায় এ রীতি কিছুটা আসা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা দেশে গত দু-তিন বছরের মধ্যে এমন কোনো দুর্যোগ ঘটে নি যে সব তরুণ লেখক শামুকের মতো দুর্যোগের চোট খেয়ে খোলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আগেই বলেছি যে ওদের দেশেও কোনো সময়ে একটা পুরো জেনারেশন-এর (যাঁরা নিজেদের 'সাহিত্যক্ষেত্রের নিউ জেনারেশন' বলে দাবি করেছেন একটি প্রবন্ধে) ক্ষেত্রে এমন ঘটে নি।

স্থতরাং সন্দেহ স্বাভাবিক যে এটা কৃত্রিমভাবে জাগিয়ে তোলা আন্দোলন। হয়তো নতুন কিছু করবার চেষ্টা কারও, কারও ইচ্ছা একটু sensation জাগানো, কেউ স্রোতে গা ঢেলে ফ্যাশন-রক্ষা করছেন, কেউ বা অন্য ধরনের কোনো ব্যক্তিগত সদ্ভাব বজায় রাখতে ইচ্ছুক।

বিমলবাবু ই. এম. ফরস্টারের যে গল্প-উদাহরণটি (নিশীথবাবুর ও তাঁর স্ত্রীর গল্প। ফরস্টারে আছে রাজা ও রানী) উদ্ধার করেছেন তাঁর রীতির স্বপক্ষে, সেটা কিন্তু ভুলভাবে তোলা হয়েছে। কার্যকারণ-সংযোগে বিন্যস্ত যৌক্তিক প্লট বোঝাতে ওটি বলেছেন। ইম্প্রেশনধর্মী গল্প সম্পর্কে বলেন নি। বস্তুত ফরস্টার গোটা বইটার কোনো ক্ষেত্রেই ইমপ্রেশনধর্মী উপন্যাস বা গল্পকে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

পরিশেষে বক্তব্য যে রীতি-সচেতনতা অন্যায় নয়, বরং কাম্য। তবে রীতি-সর্বস্বতা-পরিত্যজ্য। রীতি জীবনেরই আধার। শূন্যতার আধার যে রীতি তা শূন্যকুম্ভেরই মতো। তার শব্দ বেশী, সম্পদ কম।

শুধুমাত্র রীতির ওপর একটা আন্দোলনকে দাঁড় না করিয়ে নতুন জীবন-

বোধের সন্ধানই বোধহয় কাম্য। হয়তো ইদানীংকালে এ কথাটা তরুণ লেখকরাও বুঝছেন। তাঁদের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'এই দশকের গল্প'-এর সূচনা-পত্রে 'আঙ্গিক, রীতি, বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য'-এর কথা বলা হয়েছে। এই সমগ্রতার সন্ধান নিঃসন্দেহে শুভ।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

একটি প্রতিবাদ

পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়ে'র 'পাঠকগোষ্ঠী'তে শ্রীঅশোক রুদ্র মহাশয়ের 'পরিচয় ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা' শীর্ষক লেখাটি পড়ে আনন্দিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রটি লিখবার কথাও মনে এল। আনন্দিত হবার কারণ দীর্ঘ সময় পরে অশোকবাবু আবার একটি আলোচনার সূত্র টানলেন বলে। আর বিশেষ করে সে আলোচনা এমন একটি বিষয়ের উপর যা পাঠক ও লেখক উভয় সমাজের দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকৃষ্ট করবে।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে অশোকবাবু 'পরিচয়ে'র চারটি গল্প সম্বন্ধে আলোচনায় নেমে যে মতামত ও মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন ও যে ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন তাকে সমর্থন জানাতে আমি অক্ষম।

যদিও তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সাহিত্য-সমালোচক তিনি নন, তবে এক্ষেত্রে বিরক্তি, উষ্মা ও সর্বোপরি দুশ্চিন্তাই তাঁকে এই সাহিত্য-সমালোচনার মতো একটা ব্যাপারে টেনে এনেছে এবং একথাও তিনি জেনেছেন যে তাঁর মতো আরো অনেক 'পরিচয়' পাঠকেরই ঠিক এমনি মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ একথা মনে করা চলে যে 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠীর একটা অংশের (বড় কি ছোট বোঝা যাচ্ছে না বটে) বক্তব্যকেই তিনি উপস্থিত করার দাবি জানিয়েছেন।

তিনি সাহিত্য সমালোচক কি সমালোচক নন, তা সর্বাপেক্ষা তিনিই ভাল জানেন। তবে সমালোচনায় নেমে তিনি যে পাঠক ও লেখক উভয় মহলেই যথেষ্ট সোরগোল তুলতে পারবেন তা অনুমান করতে আটকাচ্ছে না।

শুরুতেই বলে নিচ্ছি তাঁর আলোচনার "দ্বিতীয় ভাগ", অর্থাৎ "ছোট গল্প নূতন রীতি নামে একটা movement (থুড়ি improvement শ্রীবিমল করের ইংরাজীতে)" বলে যার বিবরণ দান করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কোনো

আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু মাত্র তাঁর প্রথম অংশই আমার আলোচনার অন্তর্গত থাকবে।

আলোচনায় নেমে অশোকবাবু প্রথমেই তাঁর বিরক্তি, উষ্মা ও দুঃশ্চিন্তার কারণ বর্ণনা করেছেন এবং একথা তিনি প্রকাশ করেছেন যে গল্প চারটির লেখনরীতিই তাঁর বিরক্তির কারণ। কিন্তু রীতিটা কেন বিরক্তির কারণ তা তিনি অবশ্য আমার বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে বিরক্তি কি করে উষ্মা ও সর্বোপরি দুঃশ্চিন্তার জন্ম দিল তা তিনি খানিকটা বলেছেন বৈকি! তিনি বলেছেন রীতিটি দুর্বোধ্য। আর (অশোকবাবুর মতে) যেহেতু এই দুর্বোধ রীতি ব্যবহারের কোনো বিষয়গত অনিবার্যতা নেই সেহেতু এর ব্যবহারটা অহেতুক ও অকার্যকরী। তাহলে এই অহেতুক দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয় কিছু লুকনো আছে। এবং তা নিশ্চয়ই "লেখক হিসেবে পাঠকদের অনেক উপরে স্থান করে নেবার প্রবণতা। পাঠককে অজ্ঞ মনে করার স্পর্ধা।" সুতরাং উষ্মা অবশ্যম্ভাবী।

তাহলেই প্রশ্ন আসছে যে, বিরক্তি বা উষ্মার পেছনে সত্যি কি কোনো যুক্তি দাঁড়াচ্ছে? একমাত্র একটা মনগড়া ও নিছক ব্যক্তিগত আতঙ্ক ও অনুমান ছাড়া? আমার মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই লেখনরীতির অহেতুকতা ও অকার্যকারিতা যুক্তি দ্বারা উপস্থিত করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'দুর্বোধ্য' এই একটি মাত্র কথা ভেবে তাঁর মনে যত বিরক্তি আর উষ্মারই উদয় হোক না কেন তাতে অন্য পাঠকের বা উক্ত লেখক চতুষ্টয়ের অশোকবাবুর জন্য তাঁর শিরঃপীড়াজনিত সমবেদনা ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব জন্মাবে না।

আর এরই পরে তিনি এসেছেন দুশ্চিন্তার কথায়। সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে, "বাংলাদেশে যদি মার্কসবাদ না থাকে তো যে কোন ব্যভিচারই সেখানে সম্ভব।" তারপর তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে ইউরোপের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে ক্যাথলিক বিশ্ব-বীক্ষার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মূল্য সংরক্ষণের ক্ষমতার কথা তুলেছেন, আর আমাদের সমাজজীবনে এমনি কোনো রক্ষাকবচের অনুপস্থিতির উল্লেখ করে মার্কসবাদকে সেই রক্ষাকবচের ভূমিকায় স্থান দিতে চেয়েছেন। এ বক্তব্যে মতবিরোধ আছে কিনা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশে ক্যাথলিক ধর্ম নেই বলেও নয়, বা লিবারেলিজম নেই বলেও নয়, মার্কসবাদই এক্ষেত্রে একমাত্র

দায়িত্বাসীন। আর ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের কথা তুললে সেখানেও একমাত্র মার্কসবাদই ভবিষ্যৎ। কারণ ক্যাথলিক ধর্মই হোক, আর লিবারেলিজমই হোক তদ্দেশীয় সাহিত্য, সমাজ ও শিল্পের বর্তমান দশা বিচারে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অতীতে যাই হোক, আজ ঐ ক্যাথলিক ধর্ম আর লিবারেলিজম পুরোপুরিই শূন্য মূল্য হওয়ার পথে। কাজেই সত্যি যদি 'পরিচয়' তার এ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চায় তাহলে বাংলা সাহিত্যের যে এক অন্ধকার যুগেরই সূচনা তা ভাগ্যস্য লিখনং। একথা মানতে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার ব্যাখ্যাগত মতবিরোধ থাকলেও শেষ সিদ্ধান্তে মতবিরোধ নেই।

তাই বলে এই বক্তব্যকে সামনে ধরে তিনি যে বিভীষিকা সৃষ্টির চেষ্টায় নেমেছেন তাতে সায় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করে সাহিত্য আর সমাজসেবা যাই করার চেষ্টা হোক না কেন, প্রার্থিত ফললাভ সম্ভব নয়।

একথা বলতে হচ্ছে, কেননা, তিনি মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের (সম্ভবত তরুণতরদের) আধুনিক সাহিত্যকৃতি অনুধাবন করে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের শূন্যমূল্যতার সন্ধান পেয়েছেন। শুধু সন্ধানই নয়, এমন সিদ্ধান্তে তিনি পৌছে-গেছেন। কিন্তু কি করে, তা প্রমাণ না হলেও, যেহেতু তিনি পৌছে-গেছেন সম্ভবত সেইহেতুই, শুধু মাত্র দুঃশ্চিন্তাই নয়, এক ধরনের আতঙ্কও তাঁকে পেয়ে বসেছে। আর তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই লেখনরীতিকে (উল্লেখিত গল্প চারটির লেখনরীতিকে) বিষয়ের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবিতেও সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র দিতে তিনি অনিচ্ছুক। আর এই অনিচ্ছার কারণ ব্যাখ্যায় বলেছেন যে "এমন কোন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মার্কসবাদী সাহিত্যিক করতে পারেন না যা মার্কসবাদের মৌলিক কোন নীতির বিরোধিতা করে।" তাছাড়া লেখা চারটিকে তিনি "আবোল তাবোল" "ধাঁধা" ইত্যাদি বলেও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সাহিত্যের দরবারে এরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগও পেতে পারে না তার জন্য সত্যি তিনি কি যুক্তি উপস্থিত করেছেন? আসলে এ সমস্ত বলে তিনি ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের যে স্বীকৃত নীতি রয়েছে তারই দোহাই উপস্থিত করেছেন। সেই গণ্ডির বাইরে কোনো প্রকার পদক্ষেপকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। আর এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে একে তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নীতিজ্ঞান-

হীনতার মতো অপরাধের পর্যায়ে পর্যন্ত ফেলে ছেড়েছেন। ছোটগল্প কি, তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, একথা আজ স্বীকৃত যে তথাকথিত কাহিনীধর্মী না হলেও সার্থক ছোটগল্প সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বক্তব্যবিহীনও হবে কিনা সে প্রশ্নে অবশ্যই তর্ক উঠবে। তাই বলে সেই বক্তব্যকে (জীবন ও ইতিহাসের স্বপক্ষই হোক আর বিপক্ষই হোক) প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের রীতি ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা কেন থাকবে না ?

আর তাহলে একথা কেন ভাবা যাবে না যে, আসলে প্রগতির সমর্থক বলে নিজেকে উপস্থিত করেও, প্রগতির অর্থ ব্যাখ্যায় গতির দিঙ্‌নির্ণয় ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পরেও আসলে যে কোনো প্রকার গতিরই তিনি নিজেই বিরোধী। কারণ স্বীকৃত নীতি বলে যে চৌহদ্দি তিনি টানতে ব্যস্ত তার মধ্যে যে কোনো অর্থে গতিকেই তিনি রুদ্ধ করতে প্রয়াসী। কেননা, রীতি, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তিনি সেই গণ্ডীকে টেনে আনতে তৎপর।

এর পরে অশোকবাবু গল্পগুলির বিষয়বস্তু, শৈলী ও ভাষার ব্যবহারে এসেছেন। আশা ছিল পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যা এবার পাব। তাঁর বক্তব্যগুলি এবারে যুক্তিসিদ্ধ হবে। কিন্তু সত্যি তাই হয়েছে কিনা বিচার করে দেখা যাক।

প্রথমেই তিনি সত্যবাবুর গল্পটিকে (ঘোলা জল নোনা জল) ধরেছেন ও মুস্কিলে পড়েছেন বিষয় বুঝতে না পেরে। বুঝতে না পেরেও তিনি যেটুকু বিষয় বুঝেছেন বলে উল্লেখ করেছেন সেটুকু তুলে দিয়েই প্রশ্নটা রাখছি। "সত্যবাবুর লেখাটির নায়ক অচিন্ত্য নামক এক যুবক, সম্প্রতি যার মা মারা গেছে এবং যে বেকার, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাকে তার দাদা-বৌদির উপর নির্ভর করতে হয় এবং তার জন্য গ্লানিবোধ করতে হয়। তার চেতনা-প্রবাহের বর্ণনা ছাড়া ঘটনা বলতে ঘটে অচিন্ত্যের একটা স্বপ্ন দেখা এবং স্বমিতা নাম্নী কোন মেয়েকে বাস্তবে বা স্বপ্নে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তার হাত থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট উড়ে যাওয়া। যে নোটটা তার দরকার ছিল একটা চাকরির দরখাস্ত দেওয়ার জন্য।"

এবারে উল্টো মুস্কিলে পড়তে হল আমাকে। কারণ বিষয়গুলি পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় না বলেও তিনি যা 'বুঝেছেন', একটি ছোট গল্পের পূর্ণ কাঠামো এর মধ্যে আছে কিনা অশোকবাবুকে আমি তা ভেবে দেখতে বলছি। আর গল্পের শেষটায় সত্যি কি কিছু অসুবিধে হয় বুঝতে? চেতনা

প্রবাহের বর্ণনাই হোক আর যাই হোক, সত্যবাবুর লেখাটা যে একটা ছোটগল্প, তা চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবার বাস্তব কোনো কারণ নেই। তবে হয়তো এটুকু সত্য যে পাঠকের চিন্তা শক্তির কাছে এই লেখনরীতির কিছুটা প্রত্যাশা রয়েছে মাত্র। "লেখক হিসেবে পাঠকের অনেক উপরে নিজেদের স্থান করে নেবার প্রবণতা" কথাটাকে যদি নিছক অভিযোগ বলে মনে করি, অশোকবাবু কি বলবেন ? বরং প্রদ্যোৎবাবু ও সত্যবাবুর লেখায় এই রীতির ব্যবহারে গ্লানি ও হীনম্মন্যতাবোধের এমন একটা অন্তরঙ্গ ভাব ফুটেছে যা প্রকৃতই ভেবে দেখবার মতো।

মনের চিন্তা ও চেতনার বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপিত পাত্রপাত্রীর মনের অনেকখানি গভীর পর্যন্ত প্রকাশ করা যে সম্ভব একথা কি অশোকবাবু অস্বীকার করতে পারেন ?

এর পর তিনি প্রদ্যোৎবাবু ও দীপেনবাবুর (কথা কও, ফুলফোটার গল্প) গল্প দুটিতে এসেছেন। দীপেনবাবুর গল্পটিতে কি আছে 'বলা শক্ত' বলে শুরু করেছেন। অবশ্য এমনিভাবে শুরু করেও তিনি গল্পটির যতটা বুঝেছেন তা বেশ বুঝিয়ে বলেছেন। "কোন একটি নাম না-জানা দেশে গল্পটির শুরু, তার পার্শ্ববর্তী অন্য একটি দেশে তার শেষ। দেশ দুটো সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে তাদের মধ্যে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। গল্পের একজন নায়িকা আছেন। তিনি একজন বীর রমণী। তাঁকে নিয়ে বই লেখা হয়, গান লেখা হয়, তাঁর নাম গাঁয়ে গাঁয়ে মন্ত্রের কাজ করে। তাঁর এক যুবক স্বামী আছে, তিনিও একজন বীরপুরুষ। আইন এ দুজনের শত্রু। নায়িকাটিকে বন্দী করে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে পঙ্গু করে দেয়। পঙ্গু দশা থেকে তিনি ধীরে ধীরে আপেক্ষিক সুস্থতায় ফিরে আসেন। তিনি নূতনভাবে জীবনে প্রবেশ করে কি-ভাবে পয়সা রোজগার করবেন, কি-ভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন তা নিয়ে চিন্তিত হন। ইতিমধ্যে অন্য একটি যুবকের কথা বলা হয়। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, সে যে বেকার এবং সে যে স্বপ্ন দেখে এ ছাড়া। শেষ পর্যন্ত যুবকটি বিয়ে করে। তার আগে তার একটি স্বপ্নের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।"

দীপেনবাবুর গল্প সম্বন্ধে এই বিবরণ দান করার পরেও তিনি কোনো বিষয় খুঁজে পান নি লিখেছেন। অবশ্য শেষটায় এমন একটা হেলাফেলা ভাবে বিবরণ দিয়েছেন যে, অন্য একটি যুবক যেন হঠাৎ এসেছে গল্পে। আর যুবকটির

বিয়ের আসরে সেই রমণীর উপস্থিত হবার কথাটুকু তিনি লেখেন নি। জানি না এটা তাঁর অসাবধানতা নাকি দুর্বোধ্য বলে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন নি। একথা বলছি, কারণ এই অংশটুকুই যে গল্পের পরিণতিকে একটা সঠিক পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে তা কি অশোকবাবু লক্ষ্য করেন নি?

তিনি বলেছেন এই বিষয়গুলি অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট বলেই মার্কসবাদ-বিরোধী। কেন বিরোধী আর কোথায় অস্পষ্টতা? যে যে বিষয়গুলি তিনি বুঝেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তার থেকে খুব বেশি কিছু তো লেখক বোঝাতে চান নি, অন্ততঃ বিষয় ও বিবরণের ক্ষেত্রে। একটি মেয়ে, রাষ্ট্রের হাতে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা পেতে হল। আর তার ফলে, মানুষের মুখে মুখে, কবিতায়, গানে তার ত্যাগ ও বীরত্বের কথা প্রচারিত হবার পরে তিনি যখন প্রায় রূপকথার বীরকন্যার মতোই হয়ে উঠেছেন, ঠিক সেই সময় লেখক মন দিয়েছেন সেই রমণীর মনের অবস্থা ব্যাখ্যায়। দূর থেকে যাকে মানুষ এই অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে আসলে সেই বীর রমণীও মানুষ। তার মনের সামনে প্রশ্ন, জীবনের সামনে সমস্যা, প্রতিটি সাধারণ মানুষের মতো জীবনধারণ ও জীবিকার প্রশ্ন। আর সেই প্রশ্নের পথ বেয়েই আশা, হতাশা, স্বপ্ন ইত্যাদি অতি স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাটা প্রায় পুরোপুরিই লেখক রেখেছেন।

অশোকবাবুর মার্কসবাদবিরোধিতার নালিশটাকে মেনে নেয়া কেন হবে, অশোকবাবু বলবেন কি? অথচ এর পরেও অন্যত্র তিনি বলেছেন, "দীপেনবাবুর লেখায় কোন বিষয় আছে বলে মনে হয় না।" বিষয়টা তাহলে কি? ফলতঃ মনে হচ্ছে, বিষয়-বক্তব্য আসল কথা নয় (কারণ এ দুইই এ গল্পে আছে এবং যতটা থাকা প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ততটাই আছে), আসল কথা হচ্ছে এর লেখনরীতি ও ভাষাই (অন্যত্র তিনি তা বলেছেন) হচ্ছে তাঁর আসল আপত্তির কারণ। অর্থাৎ রীতি ও ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি মার্কসবাদকে সামনে রেখে গণ্ডি টানতে তৎপর। এর পরে প্রশ্ন আসতে পারে এ গল্প কি জীবন ও ইতিহাসের সপক্ষে? গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা যখন দেখি, সেই বীর রমণীর বৈধব্যের বেশে বদল ঘটেছে, যুবকের বিবাহ-বাসরে সহসা দেখা যায় তার সাদা কাপড়ে সবুজ সুতোর ফুল উঠেছে তখন আমরা লেখকের বক্তব্যটি পুরোপুরি বুঝতে পারি। আমরা বুঝতে পারি,

এই-ই নিয়ম, যত ভাঙ্গাগড়াই আসুক মানুষ শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতিতে পৌছয়। আবার জীবনেও এই-ই স্বাভাবিক। তাহলে এ গল্পকে জীবন ও ইতিহাসের সপক্ষে বলতেও বাধা থাকতে পারে না নিশ্চয়।

অথচ দীপেনবাবুর গল্প পড়ে অশোকবাবু যতটা বুঝেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, এই শেষ পর্যায়টুকুর উল্লেখই তাতে নেই।

এর পরে তিনি এসেছেন সৃষ্ট চরিত্রের আলোচনায়। এবং দীপেনবাবুর 'চর্যাপদের হরিণী'র সুধাময়, দেবেশবাবুর 'গোপাল ও কলকাতা'র গোপাল ও 'ইচ্ছামতী'র দীপক চরিত্রকে সামনে রেখে তিনি বিচার এবং বিশ্লেষণে নেমেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এরা সবাই যেন উদ্দেশ্যহীন, নীতিহীন ও লক্ষ্যহীন যুবক। যারা সমাজের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে ভাবতেই শেখে নি। এক চরম হতাশাজনক অবস্থায় তারা শুধু চেতনাপ্রবাহে ভেসে চলে। তিনি আশ্চর্য হয়েছেন, এই উদ্দেশ্যহীন নীতিহীনের দল শেষ পর্যন্ত 'পরিচয়ে' জাঁকিয়ে বসল বলে। শুধু তাই নয়, এরা যে বাংলাদেশের পথ ঘাট থেকে উঠে আসে নি তাও তিনি বুঝেছেন। আরো বুঝতে পেরেছেন, এরা এল কোথা থেকে—তার রহস্য।

তাহলে ভেবে দেখতে হবে, সত্যি কি এই চরিত্রগুলি বাংলাদেশের পথে-ঘাটে অনুপস্থিত? দীপক, গোপাল বা সুধাময় সত্যি কি আমাদের অত্যন্ত অপরিচিত? প্রথমেই একটা কথা বলে নেয়া ভাল। সাহিত্যিক কি সৃষ্টি করবে, কেন করবে? অশোকবাবু দাবি করেছেন গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র সমাজ ও ইতিহাসের সময় কালের বিচারে স্পষ্ট হবে, এই মাটির মানুষ হবে। ঐ দাবি আমি সমর্থন করি। তাহলে এই দাবির ভিত্তিতেই আমরা দীপক, গোপাল আর সুধাময়কে মিলিয়ে নিতে পারি (যদিও এই তিনটি চরিত্র কোনোক্রমে একসঙ্গে বিচার্য হতে পারে না। এবং অশোকবাবুকে বলতে চাই যে এই মিলিয়ে নেবার কার্যটি নিষ্ঠার সঙ্গে করতে তিনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে এদের তিনি বাংলাদেশের পথেঘাটেই খুঁজে পাবেন। আজকের সামাজিক অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনতা, নীতিহীনতার অস্তিত্ব কি তিনি দেখতে পান না? মনের সাময়িক সম্পূর্ণ হতাশ অবস্থাটা তিনি অস্বীকার করছেন। তিনি যদি বলতেন এরকম অবস্থা মুহূর্তচারী, ভেবে দেখতাম। কিন্তু যদি বলেন এরকম অবস্থা অবাস্তব তাহলে বলতে হয়, তিনি কি কোনো যুবককে হতাশায় বা ঐ রকম কোনো মানসিক অবস্থায় প্রকৃত আত্মহত্যা অর্থে ই

আত্মহত্যা করতে দেখেন নি? কোনো গৃহবধূকে কুলত্যাগ করে গ্লানি ও পাপের জীবনে ভেসে যেতে দেখেন নি? নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন। পেটের দায়েই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক কন্যাকে যে পাপের জীবনে টেনে নামাতে পারে পিতা, এমনকি মাতাও (প্রদ্যোৎবাবুর 'কথা কও' গল্প) তা তিনি না দেখলেও অন্ততঃ শোনেন নি কি? মনের কোন্ ও সামাজিক কোন্ বিন্যাসের অবস্থায় তা সম্ভব? অথচ সেই পিতার বিবেকের দংশন দেখে অথবা আত্মহত্যায় জীবনের যন্ত্রণা খোঁচাচ্ছে যে যুবক তার মনের রূপ ও চিত্র দেখে তিনি মার্কসবাদের দোহাই উপস্থিত করেন এবং 'প্রগতির চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা হল না' বলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমার মনে হয় "গোপাল চাকরি যাবার পরে আত্মহত্যা করতে মনস্থির করে, কিন্তু তাও একটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয় না। আত্মহত্যা করার ব্যাপারেও সে তার বুদ্ধি বৃত্তি খাটিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোয় না" বলে তিনি যখন প্রশ্ন তোলেন তখন তিনি আসলে একটা ছককাটা গণ্ডিরই নির্দেশ করেন। আর সত্যি যদি গোপাল তাই করে তাহলে লেখকের বক্তব্য পালটায়, গল্পের রূপও পালটায়, আত্মহত্যার প্রকৃত অর্থে তা যে আর আত্মহত্যা থাকে না বরং 'আত্মত্যাগে'র ধার ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে পর্যবসিত হয়, তিনি কি তাও অস্বীকার করবেন?

তাহলেই আসল কথায় আসা যাক। যেহেতু সাহিত্যিক নিজেও এই সমাজের মানুষ আর যেহেতু সাহিত্য হচ্ছে জীবনের নির্মাণ সেইহেতুই Gideও নয়, Camusও নয় খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশেরই পথঘাট থেকে সুধাময়, দীপক ও গোপাল উঠে আসে 'পরিচয়ে'র পাতায়। অশোকবাবু নিজেও তা একেবারে না জানেন, তা নয়। কারণ তাঁর প্রবন্ধে বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করে তিনি আমাদের সমাজের এই চিত্রই ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সুতরাং সবশেষে অশোকবাবুকে বলতেই হয়, অকারণ মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে অথবা কোনো দর্শনের চশমা চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই কোনো সুফল আশা করতে পারেন না। বিনয় ও সহানুভূতিই সাহিত্য সমালোচনার প্রাথমিক শর্ত বলে শুনেছি।

হেমেন্দ্রমোহন রায়

সাংস্কৃতি-সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসু সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

'কালিকলম' ও 'কল্লোল' এই দুটি পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বর্তমান বাঙালী সাহিত্যিকরা কেউ কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। 'কালিকলম'-এর প্রাণ ছিলেন মুরলীধর এবং 'কল্লোল'-এর দীনেশরঞ্জন। দীনেশরঞ্জন দীর্ঘদিন মৃত। পত্রিকাদুটিও অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

মুরলীধর সাহিত্য ও সাহিত্যিককে আজীবন ভালবেসে গেছেন। অপরিসীম অনটন ও নিঃসঙ্গতার ভেতর মুরলীধর শেষ জীবন কাটিয়েছেন। এ যুগ তাঁকে চেনে না, সে যুগ তাঁকে ভুলেছিল। কিন্তু মুরলীধর সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিকতম ধারার সঙ্গেও নিজের যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছেন। পাঠক হিসেবে কোনোদিনই তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য একাধারে আনন্দ, বেদনা, আশা ও উৎকণ্ঠা বোধ না করে পারেন নি। তরুণতম লেখকের সঙ্গেও তিনি আলাপিত হতে চেয়েছেন। পুরনো সঙ্গীদেরও ভুলতে পারেন নি।

অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থ প্রণয়ন করে বহু পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন এবং কতকাংশে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটির নামকরণে এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সংশয়ের অবকাশ আছে। 'কালিকলম' ঐতিহাসিক কালবিচারে 'কল্লোল'-এর অগ্রজ। গুণগতভাবেও তার অবদান উপেক্ষনীয় নয়। সুতরাং সে যুগ নিছক 'কল্লোলযুগ' নয় (আদপেই কোনো যুগ কিনা তাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে)।

তাই সে কালের জীবিত সাহিত্যিকদের প্রতি এই প্রসঙ্গে নিবেদন, তাঁরা বিশ-তিরিশের সাহিত্যান্দোলনের একটি যথার্থ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লিখুন।

মুরলীধর জীবিতকালে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মৃত্যুর পর

এইভাবেও আমরা তাঁকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কারণ এ যাবৎ মুরলীধর সম্পর্কে যৎসামান্য লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হলেও, ব্যাপক ও সত্য পটভূমিকায় সে কালের সাহিত্যান্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসলে মুরলীধরকে যথাযোগ্য আসন দিতেই হবে।

ইউজিন ডেনিসের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক, মহৎ ও সৃষ্টিশীল জীবনের নিরলস যোদ্ধা ইউজিন ডেনিস আজ মৃত।

একুশ বছরের তরুণ জাহাজ-শ্রমিক ডেনিস ১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩০ থেকেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনের শীর্ষ-স্থানীয় নেতা, ১৯৪৬-এ পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন, ১৯৫৯-এ সভাপতি। ইউজিন ডেনিসের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে যখন ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্ব এক অমোঘ ভবিষ্যতের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যখন ক্ষীয়মাণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রকে চোখের সামনে বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হতে দেখে ক্রমে ক্রমে মরীয়া হয়ে উঠল।

তাঁর কর্মস্থান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কস্‌বাদ, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রধানতম শত্রু মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আওতার মধ্যে থেকেও দেশবাসীর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, শাসকশ্রেণীর নব ঔপনিবেশিকতাবাদ ও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধায়োজনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নি গ্রোদের স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি-মৈত্রী-প্রগতিশীল জীবনের সংগ্রাম, পার্টির অভ্যন্তরে মার্কস্‌বাদের শুদ্ধতা আর বিপ্লবী কর্মধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আর্ল ব্রাউডার ও তাঁর ভ্রান্ত সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—ইউজিন ডেনিসের বিপ্লবী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের অমোঘ ইতিহাস।

শাসকগোষ্ঠী ও তার ভয়াবহ গোয়েন্দাচক্র ক্ষণতরে তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। বারেবারে কারাবরণ করতে হয়েছে, বারেবারে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অপরিসীম লাঞ্ছনার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। এবং সেই মহান আদর্শ ও প্রবল বিশ্বাস ধ্রুবতারার মতো চিরদিন ডেনিসকে পথ দেখিয়েছে।

মার্কিন প্রতিনিধি সভার কুখ্যাত 'অ-মার্কিন কার্যকলাপ' কমিটির জেরার

জবাব দিতে অস্বীকার করে কংগ্রেসের অবমাননার দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ডেনিসের সেই বিখ্যাত উক্তি চিরস্মরণীয়: 'আমার নিজের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি চাই তাবৎ মার্কিন জনসাধারণের স্বাধীনতা'।

আমৃত্যু নিজের জীবনে আপন বাণীর সার্থকতা যিনি প্রমাণ করেছেন, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ 'পরিচয়' ও বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র উৎসবের বর্ষারম্ভে

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব-বর্ষের (আন্তর্জাতিক মতে) উদ্বোধন ১লা জানুয়ারি বোম্বাইতে হয়ে গিয়েছে। যথা প্রত্যাশিত, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তা উদ্বোধন করেছেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রধান আহ্বায়ক ; নিখিল ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনটি ছিল উপলক্ষ ; এবং সম্ভবত সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাই ছিলেন উদ্যোক্তা। আশ্চর্য নয় যে, এই উৎসবে 'পরিচয়' নিমন্ত্রিত হয় নি, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরাও নিমন্ত্রিত হই নি। কারণ, নয়াদিল্লীর আমলা-সাহিত্যিক এখন নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের "স্থায়ী সভাপতি"—এমন সৌভাগ্য অবশ্য পিক্‌উইক্ ক্লাবের সুবিখ্যাত সভাপতি ব্যতীত আর সকলের পক্ষেই এতদিন পর্যন্ত দুর্লভ রয়েছে। যাই হোক, দেশীয় ও বিদেশীয় সজ্জনদের উপস্থিতিতে এই শতবার্ষিকী উৎসব যে ঘটা করে উদ্‌যাপিত হতে পেরেছে, তাতে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ আমলা-রাজের সাহিত্য শাসনে কৃতার্থ বোধ করেছেন।

কারণ ঠিক সে সময়েই বিশ্বভারতীর উপাচার্য উৎসব সংকট সম্বন্ধে বিলাপ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কেন? রবীন্দ্র-উৎসবে দেশের কি আগ্রহ কিছু-মাত্র হ্রাস পেয়েছে? না, বিশ্বভারতী সরকারী মসনদের ছত্রছায়া লাভ করে দেশের সাধারণ মানুষের ও শিক্ষিত মনের সান্নিধ্য হারিয়ে বসছে? প্রশ্নটা কঠিন। উত্তর কিন্তু আগামী দিনের বাঙলা দেশের সহস্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শান্তিনিকেতনের দিকে দেশ-বিদেশের সুধী-সমাজ তাকিয়ে আছে। একথা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান, নিশ্চয়ই তার কর্তৃপক্ষেরও তা বিদিত।

বিদেশে যাঁরা রবীন্দ্র-উৎসবে অগ্রসর তাঁরা জানতে সমুৎসুক—শান্তিনিকেতনে শতবার্ষিক উৎসব কবে প্রতিপালিত হবে ; নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর উৎসবই বা কবে ? আমরাও অবশ্য তা জানি না। কিন্তু মনে হয় এ সব উৎসবের সম্বন্ধে দিন ও কার্যক্রম প্রভৃতি স্থির করা ও ঘোষণা করা এখন আবশ্যক।

পশ্চিম বাঙলার রাজ্য-কমিটির উৎসবের সম্ভাব্য কার্যক্রম অবশ্য গত বৎসরই ঘোষিত হয়েছিল। তার পরে আর সে সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষ কিছুই শোনে নি। উদ্যোগ-আয়োজনেরও লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দুর্লক্ষ্য। আমরা অবশ্য তার 'সাধারণ কমিটিতে' "অধিকন্তু"। কিন্তু যাঁরা পূর্বাপর সদস্য তাঁদের প্রমুখাৎ-ও জানা যায়—সভাপতি ডাক্তার রায় ৮।১০ মাসের মধ্যে সে কমিটির কোনো সভা আহ্বান করা প্রয়োজন মনে করেন নি। রাজ্য-কমিটির সমস্ত আয়োজন কী গতিতে ও কী পদ্ধতিতে পরিচালিত, তা অনুমেয়। এ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সৌম্যেন্দ্রনাথ যে নাগরিক উৎসব-কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন, তাকে তাই সুসঙ্গতই বলতে হবে। পঃ বঃ রাজ্যকমিটির একটি প্রয়াসের সঙ্গে সাধারণ পরিচিত হয়েছে—সুলভ রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের আয়োজন। নিশ্চয়ই তা অভিনন্দনযোগ্য। নিয়ম-কানুনের অঙ্কুশ-তাড়নায় কোনো সত্যকার প্রার্থী এখন বঞ্চিত না হলে রাজ্য-কমিটি দেশের একটি দাবি অন্ততঃ পূরণ করবেন। শেষ পর্যন্ত, রবীন্দ্র-সাহিত্য গ্রন্থাবলী শিক্ষা বিভাগের 'কিশলয়' না হয়ে উঠলেই হয়।

বিশ্বভারতীর প্রকাশ-পরিকল্পনা

অত্যন্ত আশ্বস্ত হলাম বিশ্বভারতী প্রকাশনীর 'রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি গ্রন্থমালার' প্রকাশ-পরিকল্পনা দেখে। ইতিমধ্যেই অবশ্য সুদীর্ঘকালের অপেক্ষিত 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ; এবং 'খৃস্ট', 'ভারত-পথিক রামমোহ' 'রবীন্দ্র জীবন-কথা' (প্রভাতকুমারের) ও 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' (ইন্দিরা দেবীর) প্রভৃতি পুস্তক ও গীতাঞ্জলির ক্ষুদ্রায়তন সংস্করণ ও সাধারণের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু বিশ্বভারতী প্রকাশনীর সমস্ত আয়োজনটিই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশে বিশ্বভারতীর সম্পাদকীয় যত্ন শুধু প্রশংসনীয় নয়, বাঙলা গ্রন্থ-সম্পাদনের ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য। সেই নীতি-অনুসরণ করে বিশ্বভারতী ১। অসংকলিত রচনার সংকলন ও

'প্রকাশ' ২। 'বিষয়ানুক্রমে রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশ', ৩। 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ', ও ৪। 'পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ' প্রভৃতি নানা ধারায় বহু গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য গবেষণার ও আলোচনা এই আয়োজনে বিশেষ সহায়তা লাভ করবে। আর, এরূপ সহায়তা দান না করে রবীন্দ্র-গ্রন্থের শুধু পুনর্মুদ্রণ করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের রবীন্দ্র-ব্যবসা পরিচালনার আজ কোনো অর্থ হয় না। কারণ, আজ বিশ্বভারতীর ব্যয় তো সরকারই বহন করে।

এ জন্যই দেশের লোকের সুলভ রবীন্দ্র-সাহিত্য লাভের দাবি অপ্রতিরোধ্য। সরকারী সহায়তা পেয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনী কি তা পূরণ করতে পারতেন না ? সেক্রেটারিয়েটের হাতে তুলে দিতে গেলেন কেন ? যাই হোক, বিশ্বভারতী প্রকাশনী যে নির্বাচিত একখণ্ড রবীন্দ্র-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন আশা করি তাও সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে হবে—বিষয় নির্বাচনে ও আয়তনে এবং মূল্যে। কারণ, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' বা 'রবীন্দ্রসাহিত্য গ্রন্থাবলী' সকলের সব সময়ে প্রয়োজন হয় না। তাঁদের প্রয়োজন সুনির্বাচিত দেড় দুই হাজার পৃষ্ঠার (১।২ খণ্ড) গ্রন্থে অধিকতর সিদ্ধ হতে পারে।

এসব আয়োজন এই বর্ষকালের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারলে বিশ্বভারতী আপনার দায়িত্ব কতকাংশে পালন করবেন।

চিত্র-প্রদর্শনী

কাল সর্বজয়ী। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার জন্মক্ষেত্র কলকাতা। আজকের অনেক চিত্র-প্রদর্শনীতে গেলেই একথা আর মনে পড়ে না। যে কাল-জটিলতা য়ুরোপের শিল্প-পারম্পর্যে বিপ্লবকে পুনঃপৌনিক করে তুলেছে—চিত্রকলা ও ভাস্কর্য থেকে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে তার কাব্যে সাহিত্যে,—আমাদের শিল্পি-চৈতন্যেও আজ তার আবর্ত রচনা অনস্বীকার্য। দেশের চিহ্ন যাচ্ছে মুছে, শিল্পসাহিত্যে এখন কালের স্বীকৃতি। 'মডার্নিজম্' কৃত্রিম নয়, নিঃসন্দেহ ; শিল্পেসাহিত্যে কতকটা তা অগ্রগামিতার অন্বেষণ, কতকটা অবক্ষয়ের অপঘাত। অর্থাৎ মডার্ন কালেরই প্রতিচ্ছায়া। তরুণ শিল্পী দেবকুমার রায় চৌধুরী তিন বৎসর পরে দেশে ফিরে তাঁর নবায়ত্ত কলা-পদ্ধতির প্রথম

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা (১১-২৪শে জানুয়ারি, ১৯৬১) করেছিলেন একাডেমির গৃহে। ইতালিতে তাঁর শিক্ষা, তবে য়ুরোপের বহু দেশেই শিক্ষার ও পরী স্বযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। বিস্তৃত ভাণ্ডার থেকে ২৬ খানা চিত্র ও ৬ গ্লেজ টালি মাত্র শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করেন—যাঁরা তাঁর কাজ দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন তিনি একেবারে নূতন ভাষা আয়ত্ত করেছেন তাঁর পূর্বেকার ভাষাসমস্যা ঘুচে গিয়েছে। রঙের সংযত প্রয়োগ আকারের সরলতা আধুনিক শিল্পের স্পেস বর্ণ-রেখার পরীক্ষা,—তা বহু কলা-কৃতিত্বের প্রমাণ। এবং দু-এক ক্ষেত্রে অমূর্ততার আতিশয্যে দর্শ পরীক্ষা-স্থল—সত্যই যে কী প্রতিবেদনা তা সঞ্চার করে তার চিত্রে অবশ্য কালো মূর্তি কিংবা আলেখ্য, (১) সকলকেই স্বচ্ছন্দে আনন্দদান কর 'সুষমা', 'যৌবন', 'যুগল' 'বিশ্রাম-রত স্ত্রী-নারী', 'উপবিষ্টা', চিত্রগুলি ঐশ্বর্য, বিন্যাসকুশলতায় ছন্দে সাহসে নিশ্চয়ই প্রীতিপ্রদ, ৩নং কানিভাল 'রঙের বিন্যাস (১৫), বিন্যাস (১৮) প্রভৃতি চিত্রেও শিল্পী সফলকাম দেবকুমারবাবুকে এসব ক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হবে—কারণ, তাঁর দে মানুষ এ ভাষায় এখনো অভ্যস্ত নয়।

অনেক কাল পরে শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ পাল আবার সাধারণের সম্মুখে আবি হলেন—এইটি সুসংবাদ। রথীন্দ্র মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ পাল সহযোগী মিশ্রের সঙ্গে তাঁদের শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা 'আর্টিষ্ট্রি হাউসে'। তাঁরা গোত্রের নয়, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। হেমন্ত মিশ্রের একক প্রদর্শনীতে গত আমরা আনন্দ লাভ করেছিলাম,—'কিউবিস্ট' রীতিতে তাঁর ঝোঁ এবারকার ১১খানা চিত্রে তা আরও বর্ধিত হবে—তাঁর দক্ষতা হালকা রঙের ব্যবহার, জ্যামিতিক রেখায়, সকোণ বঙ্কিম আকৃতিতে নান ও ছন্দ চমৎকার ফুটেছে। বিশেষ করে আমাদের আনন্দ দিয়েছে 'ফোটা ঋতুবঙ্গ' (১), 'সত্যের বেদিকা' (৪নং), 'বসন্ত' (৬) প্রভৃতি কয়েকখানা।

প্রাণকৃষ্ণ পাল এতকাল পরে মাত্র ১০ খানা চিত্র উপস্থাপিত করেছে তার মধ্যে খান দুই একেবারেই জ্যামিতিক রেখার চিত্র, অর্থ থাকলেও তার রস উপভোগে বঞ্চিত। কিন্তু 'জ্যোৎস্নায় মাছ ধরায়' (৩) তিনি সার্থক পরীক্ষা করেছেন, কিংবা 'নভঃ উদ্ভাস' (২) বা 'শৃঙ্খলিতা (৫), চিত্রে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তা আমাদের আনন্দ দান করে

কাঠের উপর আঁকা মুখোসটি (৮) নিশ্চয়ই কৃতিত্বসূচক। প্রাণকৃষ্ণ পাল, আশা করি, এখন আবার অদৃশ্য হবেন না।

হেমন্ত মিশ্র ও প্রাণকৃষ্ণ পাল দুজনারই মধ্যে মণ্ডন-শিল্পের ঝোঁক। রথীন্দ্র মিত্রের চিত্র অন্যবিধ। তাঁর চিত্রই ছিল বেশি—২২ খানা। আলোর প্রকাশে, রঙের নানা বৈচিত্র্যে, বেধ (ডেপ্‌থ) রচনায় তাঁর নিজস্বতা পূর্বাপর অক্ষুন্ন। প্রায় অধিকাংশ চিত্রই দৃশ্যচিত্র, আর তাতে বুদ্ধির অগম্য কিছু নেই—যদিও রীতির বৈশিষ্ট্য আছে।

এইখানেই গোড়ার প্রস্তাবের কথা ওঠে। রূপশিল্পের যা পূর্বতন ধারা ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্তন হচ্ছে এ দেশেও। বলেছি তা কালের ধর্ম। "মানুষ নকল করবে না—রচনা করবে"—এ হচ্ছে শিল্পের স্বীকৃতি সত্য। 'রচনার' যে বিশেষ রীতি একাল আবিষ্কার করেছে তাতে বিশেষ অধিকার আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দর্শকের। শিল্পীর এ দাবি য়ুরোপের দর্শক স্বীকার করে এখন তার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের দর্শকের সে প্রস্তুতি এখনো নেই শিল্পীদেরও। অনেক সময় প্রস্তুতিটা এখনো অসম্পূর্ণ। দুদিকের সেতুহীন শূন্যতার মাঝখানে অবশ্য নয়াদিল্লী ও বোম্বাইর বাক্‌-চাতুর্য ও বিক্রয়-চাতুর্য একটা মায়ামার্গ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তা রূপ-রসের অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্‌ যোগাযোগ নয়—রৌপ্য-রসের স্থূল আকর্ষণ। কবির ভাষায় বলতে চাই—"বিষয়বস্তুহীন ছবির বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সংগীতের আলাপ। বস্তুতঃ আমার নিজের ঝোঁক ঐদিকে। কিন্তু ছবি যদি সাহিত্য বিষয়কে অবলম্বন করেও আপন সতীত্ব রক্ষা করতে পারে সেও তো কম কথা নয়।"—নিশ্চয়ই নিছক কালোয়াতির থেকে তা রসিকেরও বেশি উপভোগ্য।

গোপাল হালদার


ফাল্গুন
পরিচয়
১৩৬৭

পত্রিকা প্রসঙ্গ

একতা॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ মুখপত্র : ১৯৬০। সম্পাদক : পবিত্র সরকার॥

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ পত্রিকা (বিজ্ঞান বিভাগ) : ১৯৬০। সম্পাদক : পীযূষকান্তি রায়॥

যে গণতান্ত্রিক চেতনায় ছাত্রসংসদগুলির উদ্ভব তারই অগ্রগতিতে সম্ভবত বিদ্যায়তনে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা। বছরে একটি সংকলন প্রকাশ ছাত্র-সাধারণের সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের উল্লেখযোগ্য সহায়ক না হলেও, ছাত্র মনের ও মননের, সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার সামগ্রিক ধারক ও মুখপত্র হিসাবে তার মূল্য অনস্বীকার্য। প্রচলিত অর্থে সাময়িকপত্রের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েও, তাই শিক্ষানিকেতনের পত্রিকাগুলি, উদ্দেশ্যে ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার অধিকারী। এই স্বাতন্ত্র্যের পটভূমিকাতেই ছাত্র-সংসদের মুখপত্রগুলি বিচার্য।

একতার বাংলা বিভাগটির শুরু জর্মান প্রতীকী কবি রিল্‌কের উদ্ধৃতিতে, অরুণ সেন ও পদ্মনাভ দাশগুপ্তের স্থাপত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে। শহরজীবনের বৈপরীত্য ও কলকাতার স্থাপত্যে দুই শতাব্দীর মানসিকতা এ প্রবন্ধে সার্থকরূপ লাভ করেছে। শেষাংশটি আরো বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। "আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা" সংক্রান্ত অশোক ভট্টাচার্যের আলোচনাটি একটি সৃষ্টিশীল রচনা। আত্মসচেতনতা ও যুগচেতনায় সমৃদ্ধ আধুনিক শিল্পীরা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর গৌরবে. এদেশেও যে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে এ বিশ্বাসে লেখক সোচ্চার। তাছাড়া বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বিজন পুর-কায়স্থের প্রবন্ধ "নীতি ও মূল্যবোধের কয়েকটি দিক।" লেখক মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নীতি ও মূল্যবোধের বিচার করেছেন, বস্তুজগতের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস ও সমাজপ্রগতির প্রতি অবিচল আস্থার পটভূমিকায়। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অধিক অবকাশ থাকলেও মঞ্জুলা সরকারের প্রবন্ধটি সার্থক।

কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের আলোচনা করে তিনি কালিদাসের ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা নৈপুণ্য ও কনট্রাস্ট সৃষ্টির কুশলতা প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। অন্যদিকে ইংরেজী বিভাগের শুরুও প্রবন্ধে। মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা স্বল্পপরিসরে চার্টিস্‌ম্ পর্যন্ত ইংরেজ শ্রেণীসংগ্রামের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

গল্পের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'ঝড়ো হাওয়া'। ভাঙা সিনেট, মজবুত আশুতোষ বিল্ডিং—গোটা ইউনিভার্সিটির পটভূমিকায় লেখক বর্তমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় বিড়ম্বিত ছাত্রজীবনের আর্তিকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। চন্দ্রকুমার প্রসাদের "কাঁচপোকার টিপ"-এ স্যানাটোরিয়ামের নিখুঁত চিত্র ও টি. বি. রোগীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা জীবন্ত। অসীম সেনগুপ্তের "কারো একটা গল্প" ছোটগল্পে সাম্প্রতিক নিরীক্ষার লক্ষণাক্রান্ত।

প্রায় সবকটি কবিতাই সুলিখিত। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মনিভূষণ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত বসু, রঞ্জিত সিংহ ও আশিষ সান্যালের কবিতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদে কেতকী কুশারী সার্থকতা দেখিয়েছেন।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য সাময়িক ঘটনার মন্তব্য সহ প্রতিলিপি, বাংলায়—"প্রাসঙ্গিক" এবং ইংরেজীতে "topics and opinions"। প্রাসঙ্গিকে স্থান পেয়েছে সম্পাদকের কথা, সাতটি মৃত্যু (রাজশেখর বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, ইন্দিরা দেবী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পাস্তেরনাক, আলবেয়র কামু ও সিনেট), কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের জনসংবর্ধনা ও শিক্ষাসংস্কারের মূল সমস্যার কথা। ইংরেজী অংশে বিচিত্র বিষয়ের প্রস্তাবনায়, সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে, ছাত্রজীবনের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন সবিশেষ উপস্থাপিত হলে ভালো হত।

হিন্দী ও উর্দু বিভাগের আলোচনায় আমার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এই বিভাগ দুটি দেশের বর্তমান ভাষাদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার ছাত্রসমাজের সাধারণ ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে "একতা"র রবীন্দ্রবিষয়ক বিশেষ আলোচনা থাকা উচিত ছিল। "একতা"য় রবীন্দ্রস্মরণী বিশেষ সংখ্যা সম্ভবত ভবিষ্যতে সে অভাব পূর্ণ করবে।